M.Phil.

401288

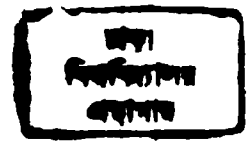

# নজরুল সঙ্গীতে স্বদেশচেতনার স্বরূপ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা ও সঙ্গীত বিভাগে এম ফিল
ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

মে; ২০০৩

GIFT

401288

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

নাট্যকলা ও সঙ্গীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

*Dhaka University Institutional Repository*

এম ফিল অভিসন্দর্ভের শিরোনাম

# নজরুল সঙ্গীতে স্বদেশচেতনার স্বরূপ

গবেষক

**রোকসানা হোসেন**

রেজি নম্বর : ৫৪/৯৮-৯৯

401288

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

তত্ত্বাবধায়ক

**ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী**

সহযোগী অধ্যাপক,

নাট্যকলা ও সঙ্গীত বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

*Dhaka University Institutional Repository*

# ঘোষণাপত্র

আমি রোকসানা হোসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নাট্যকলা ও সঙ্গীত বিভাগের একজন এম ফিল গবেষক। আমার রেজি নং- ৫৪/৯৮-৯৯। আমি এম ফিল ডিগ্রির জন্য **নজরুল সঙ্গীতে স্বদেশচেতনার স্বরূপ** বিষয়ে অভিসন্দর্ভ উপস্থাপন করছি। আমি ঘোষণা করছি যে ইতিপূর্বে এই অভিসন্দর্ভ অথবা এর অংশ বিশেষ কোনো পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি এবং কোথাও ডিগ্রির জন্য জমা দেয়া হয়নি।

401288

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

রোকসানা হোসেন
গবেষক
তারিখ, ঢাকা : ০৮/০৫/০৩

*Dhaka University Institutional Repository*

# সূচিপত্র


| প্রথম অধ্যায় | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| ১. ভূমিকা | ৫ |
| ২. বাংলা গানে স্বদেশচেতনার উৎস | ৭ |
| ৩. বাংলাদেশে স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাস | ১৪ |
| **দ্বিতীয় অধ্যায়** | |
| ১. নজরুল পূর্ববর্তী বাংলা গানে স্বদেশচেতনা | ১৮ |
| ২. নজরুলের স্বদেশচেতনার উৎস ও পটভূমি | ২৬ |
| ৩. নজরুল-সাহিত্যে স্বদেশচেতনা | ৩৩ |
| **তৃতীয় অধ্যায়** | |
| ১. নজরুল সঙ্গীতে স্বদেশচেতনার স্বরূপ। | ৪১ |
| ২. উপসংহার | ৬৯ |
| **চতুর্থ অধ্যায়** | |
| ১. নজরুলের স্বদেশচেতনামূলক গানের তালিকা | ৭২ |
| ২. গ্রন্থপঞ্জি | ৮০ |

Dhaka University Institutional Repository

# ভূমিকা

হাজার বছরের বাংলা গানের ইতিহাসে যে দুটি নাম সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তাঁদের প্রথম জন যদি হন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; তাহলে দ্বিতীয়জন নিঃসন্দেহে কাজী নজরুল ইসলাম। উভয়ই বাংলা সংগীতকে সমৃদ্ধ করতে অসাধারণ ভূমিকা রেখেছেন; রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত-প্রতিভা নিয়ে পূর্ণাঙ্গ এবং বহুমুখী আলোচনা হলেও নজরুল সঙ্গীত বিষয়ক আলোচনা সে তুলনায় কম। আমরা **নজরুল সঙ্গীতে স্বদেশচেতনার স্বরূপ** বিষয়ে অভিসন্দর্ভ রচনায় আগ্রহী হয়েছি দুটি প্রধান কারণে। প্রথমটি হচ্ছে নজরুল বাংলা দেশাত্মবোধক সঙ্গীতের একজন প্রয়োজনীয় ও উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। দ্বিতীয়টি হচ্ছে নজরুলের গানের এই দিকটি নিয়ে পূর্ণাঙ্গ ও বিস্তৃত গবেষণা পরিলক্ষিত হয়না। যদিও গবেষক করুণাময় গোস্বামীকে এ বিষয়ের পথিকৃত বলা যায়। বৃটিশ শাসিত ভারতবর্ষের আর কোনো কবি-গীতিকার সঙ্গীত রচনা করে দেশবাসীকে এমনভাবে আন্দোলিত বা উজ্জীবিত করতে পারেননি। কাজেই নজরুলের স্বদেশচেতনামূলক গান সম্পর্কে আলোচনা করার যৌক্তিকতা ও সুযোগ রয়েছে।

সঙ্গীত শুধু বাঙালির আনন্দ-বিনোদনের উপকরণই নয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক সামাজিক-সংকটে গানের মধ্য দিয়ে বাঙালির ঐক্যবদ্ধ চেতনার সুর ধ্বনিত হয়েছে। বিশেষ করে বৃটিশ শাসিত ভারতবর্ষে পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্তির জন্য প্রেরণামূলক দেশাত্মবোধক বাংলা গানের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। যদিও নানা সময়ে বাংলা গানে বাঙালির স্বদেশচেতনার পরিচয় বিধিত হয়েছে। সেই রামনিধি গুপ্ত (১৭৪১-১৮৩৯) থেকে শুরু করে, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অতুল প্রসাদ প্রমুখ দেশাত্মবোধক বাংলা গানের ধারাকে পুষ্টিদান করে কৈশোর উত্তীর্ণ করেছেন। আর নজরুলের আর্বিভাবে এই ধারা লাভ করেছে তার যৌবন-তারুণ্য। আর এ কারণে বিশ শতকের স্বদেশচেতনামূলক বাংলা গানে নজরুলের প্রতিভা ও কীর্তি যে সমকালীন কবিদেরকে অতিক্রম করে গেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। নজরুল তাঁর যৌবনের ছয়-সাত (১৯২০-১৯২৬) বৎসর মূলত স্বদেশচেতনামূলক গান রচনা করেছেন। এই গানগুলি আবার নানা উপধারায় বিভক্ত। কোনোটি দেশবন্দনা, কোনোটি পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্তির কোনোটি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রভৃতি বিষয়ক। অর্থাৎ দেশচেতনামূলক হওয়া সত্ত্বেও এগুলোর মধ্যে অনেক বৈচিত্র্য রয়েছে। এ সমস্ত উপধারার গানগুলো নিয়েও এই অভিসন্দর্ভে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে আরও একটি প্রসঙ্গ বলে নেয়া ভাল যে আমরা অভিসন্দর্ভের শিরোনাম ঠিক করেছি 'নজরুল সঙ্গীতে স্বদেশচেতনার স্বরূপ' অর্থাৎ নজরুলের গানে দেশচেতনা। আর এ কারণে নজরুলের কোনো কোনো ইসলামী সঙ্গীত বা শ্যামাগীতি কিংবা হাসির গান যেখানে স্বদেশচেতনা প্রতিফলিত হয়েছে সে গানগুলোর আলোচনা করেছি বা প্রসঙ্গ এসেছে। অর্থাৎ দেশাত্মবোধক গান না হলেও একজন কবির যে-কোনো গানে দেশচেতনা থাকতে পারে। নজরুলের ক্ষেত্রে তাঁর শিল্পী মানসের স্বভাবজাত এ বিষয়টি লক্ষ করা গেছে। মাতৃভূমির প্রতি কবির প্রগাঢ় ভালবাসার কারণে তিনি তাঁর প্রায় সমস্ত কর্মেই কম-বেশি স্বদেশপ্রেমের স্বাক্ষর রেখেছেন। এ দিক দিয়ে তাঁর সঙ্গে কারও তুলনা চলে না। গীতিকার নজরুলের দেশচেতনামূলক অনেক গানের-ই আবার ঘটনাগত বা ঐতিহাসিক পটভূমি রয়েছে। যেহেতু নজরুল ছিলেন সমকাল সচেতন আবেগী কবি কাজেই তাঁর গানে যে সমকালের

Dhaka University Institutional Repository

ঘটনার প্রভাব থাকবে— এটাই স্বাভাবিক। তাই বৃটিশবিরোধী আন্দোলনে, স্বদেশী আন্দোলনে বাংলার শোষিত মানুষের পক্ষে, ধর্মান্ধতা ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে গান রচনা করে দেশাত্মবোধের উদ্দীপনা ছড়িয়ে দিয়েছেন এদেশের মানুষের মধ্যে। একই সঙ্গে বাংলার কাব্য-সঙ্গীতকে এক নতুন ধারায় প্রবাহিত করেছেন তিনি। তাঁর গানের বাণী ও সুরের যোজনায় দেশপ্রেমের জোয়ার তৈরি হয়েছিল। এবং সে জোয়ারে দেশের স্বাধীনতা উদ্ধারের জন্য তরুণ সমাজ ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সে দিন। তাই গান রচনা করে ও গেয়ে নজরুলের মতো করে আর কেউ বাঙালিকে এভাবে উদ্বুদ্ধ করতে পারেননি।

আমরা আলোচনার সুবিধার জন্য এবং নজরুলের স্বদেশচেতনামূলক গানের স্বরূপ বুঝতে 'বাংলা গানে স্বদেশচেতনার উৎস' নিয়ে প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। এখানে চর্যাপদ থেকে শুরু করে শাক্তপদাবলী পর্যন্ত আলোচনা স্থান পেয়েছে। এরপর 'বাংলাদেশে স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাস' পরিচ্ছেদে বাংলাদেশে দেশাত্মবোধের আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন ঘটনা-প্রতিষ্ঠান-সম্মেলন এমনকি ব্যক্তি বিষয়েও ঐতিহাসিক আলোচনা করেছি। দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'নজরুল পূর্ববর্তী বাংলা গানে স্বদেশচেতনা' কোথায়-কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তার একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র দেয়া হয়েছে। এরপর 'নজরুলের স্বদেশচেতনার উৎস ও পটভূমি' আলোচনা করা হয়েছে তাঁর জীবন ও অভিজ্ঞতার ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত থেকেই। যেহেতু নজরুল শুধু গীতিকার-সুরকার-ই নন তিনি একজন বড় মাপের সাহিত্যিকও তাই তাঁর সাহিত্যে কিভাবে দেশ ভাবনা ফুটে উঠেছে এ বিষয়টি স্পষ্ট করতে পরের পরিচ্ছেদে আমরা 'নজরুলের সাহিত্যে স্বদেশচেতনা'র বিষয়ে ধারণা দিতে চেষ্টা করেছি।

সবশেষে এই অভিসন্দর্ভের শিরোনাম অধ্যায়ে আমরা প্রথমে নজরুলের দেশাত্মবোধক গান সম্পর্কে বিভিন্ন গবেষকদের মন্তব্য উপস্থাপন করে সেগুলোর মধ্য থেকে মূল কথাটি বের করে আনতে চেষ্টা করেছি। পরে স্বদেশচেতনামূলক গানের শ্রেণীকরণ করে প্রত্যেকটি শ্রেণীর পৃথক আলোচনা ও গানের তালিকা দেয়া হয়েছে। সবশেষে প্রাসঙ্গিক বিবেচনা সমূহ যেমন সুর, অন্যধারার স্বদেশচেতনামূলক গান প্রভৃতি বিশ্লেষণ করে নজরুলের গানে স্বদেশচেতনার স্বরূপ আলোচনা করা হয়েছে।

নজরুল যে বড় মাপের সংগীত-প্রতিভা এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই প্রতিভার স্বরূপ উপলব্ধি এবং মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। এই অভিসন্দর্ভে সীমিত পরিসরে হলেও তাঁর দেশাত্মবোধক গানগুলো আলোচনা ও বিশ্লেষণ করে স্বদেশচেতনার স্বরূপ এবং নজরুল-প্রতিভার পরিচয় তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি।

এই অভিসন্দর্ভ রচনার জন্য আমি প্রথমেই কৃতজ্ঞতা জানাই আমার শিক্ষক, তত্ত্বাবধায়ক এবং বিশিষ্ট সঙ্গীত গবেষক ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তীকে। তিনি বিভিন্ন সময়ে তাঁর মূল্যবান পরামর্শ ও সহযোগিতা দিয়ে আমাকে ঋণাবদ্ধ করেছেন। এরপরই বলতে হয় ড. করুণাময় গোস্বামীর কথা। যাঁর বইগুলি থেকে আমি সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়েছি। উল্লেখ করতে হয় নাট্যকলা ও সঙ্গীত বিভাগের আমার প্রয়াত শিক্ষক এবং বিশিষ্ট নজরুল সংগীত শিল্পী নিলুফার ইয়াসমীনের নাম। তাঁর কাছে আমার ঋণ অপরিশোধ্য। সবশেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমী, নজরুল ইন্সটিটিউট, নজরুল একাডেমীর প্রতি কৃতজ্ঞ বিভিন্ন ভাবে তাদের সহযোগিতা পাবার জন্য।

*Dhaka University Institutional Repository*

# বাংলা গানে স্বদেশচেতনার উৎস

বাংলা গানের ঐতিহ্য হাজার বছরেরও অধিক। বলা যায় বাংলা ভাষা উদ্ভবের কাল থেকেই প্রচলিত ছিল বাংলা গান। সেই প্রাচীন আমলে লিখিত ভাষার নিদর্শন না থাকলেও (চর্যাগীতিকার পূর্ববর্তী সময়) বাঙালির মুখে মুখে প্রচলিত ছিল লোকসাহিত্য বা লোকগান। সেকালেও মানুষ দৈনন্দিন জীবনযাপনের পাশাপাশি তাদের অভিজ্ঞতা, অনুভূতি, আবেগ প্রভৃতি নির্ভর করে রচনা করেছেন লোকসাহিত্য। এই লোকসাহিত্যেরই এক বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে প্রাচীন বাংলা গান। লিখিত আকারে এই সমস্ত গান না থাকায় আজ আর আমাদের হাতে পৌঁছায়নি তার অধিকাংশ নিদর্শন। কিছু ছেলে-ভোলানো ছড়া, ঘুমপাড়ানি গান, খনার বচন, বৃষ্টি নামানো গান, কখনো আংশিক কখনো খণ্ডিত আকারে পাওয়া গেছে। এই গান-গুলির মধ্যে দৈনন্দিন জীবন-অভিজ্ঞতার যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা প্রকারান্তরে তৎকালীন মানুষের জীবন সমাজ বা স্বদেশ ভাবনার পরিচায়ক। মূলত পাল এবং সেন আমলে, অষ্টম নবম শতকে বাংলা ভাষার উষা লগ্নে প্রথম রচিত হয়েছিল বাংলা গান। "এই যুগেই বাংলা সাহিত্যের প্রথম সৃষ্টি হয়। এর আগে বাঙালি সাহিত্য, সঙ্গীত যা সৃষ্টি করেছে তা সংস্কৃত বা প্রাকৃত ভাষায়। বাংলা ভাষা সৃষ্টি হবার পরই বাংলা সঙ্গীতের জন্ম এবং তখন থেকেই বাঙালীর সঙ্গীত সাধনা শুরু হয়। বাঙালীর এই সঙ্গীত সাধানার মাধ্যমেই তার সাহিত্য চর্চা। অর্থাৎ চর্যাপদ বা চর্যাগীতির মাধ্যমেই বাঙালির সাহিত্য চর্চা শুরু হয়।

একাদশ শতাব্দীর শেষে সঙ্গীতের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করে রামাবতী নগরী। রামপাল এই নগরীর পত্তন করেছিলেন। পাল রাজত্বের পর সেন বংশ বিশেষ করে বল্লাল সেনের রাজত্বে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রসার ঘটে" (বুদ্ধদেব রায়: ১৯৯০: ১)। অবশ্য এ সময়ে লোকায়ত সঙ্গীতের যে প্রচলন ছিল তা জানা যায়। বিশেষ করে শর্বরী গোন্ডাকিরী প্রভৃতি লোকায়ত রাগ সৃষ্টি হয় এ সময়েই। পরবর্তীতে বাংলায় সঙ্গীত চর্চার এ ধারা অব্যাহত থাকে। প্রাচীন কাল থেকেই এ উপমহাদেশে সংগীতের দুটি ধারা প্রচলিত ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। এর একটি দেশী, অপরটি মার্গ। মার্গ হচ্ছে বর্তমান প্রচলিত রাগ সংগীত আর অপর দেশী ধারাটি হচ্ছে লোক সাধারণের চিত্ত মনোরঞ্জনের সাধারণ সাংগীতিক ধারা। প্রাচীন কাল থেকেই যে বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে সংগীতের চর্চা চলে আসছিল সে বিষয়ে সংগীত গবেষকদের কোনো সন্দেহ নেই।

'বাঙালি ভাবপ্রবণ গীতি প্রধান জাতি এই গীতির মধ্যদিয়ে বাঙালির সর্বোত্তম পরিচয় ফুটে উঠেছে যা অন্যকোন প্রকাশ লীলায় সম্ভব হয়নি মীননাথ থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাঙালির প্রকাশ ধর্মীতার সার্থক ফসল তার গীতি বা গীতি-কবিতা। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য তথা

Dhaka University Institutional Repository

সঙ্গীতের স্বরূপ যে চর্যাগীতির সন্ধান পাওয়া যায় তা-ও কয়েকটি গীতি। তবে চর্যার পূর্বেও বাংলায় সঙ্গীতের চর্চা ছিল এবং উৎকর্ষও লাভ করেছিল। এমন অনুমান করা যায় সেই সময় কালের খোদাইচিত্রে অঙ্কিত নৃত্যভঙ্গি এবং বাদ্য যন্ত্রের নিদর্শন দেখে' (মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী : ১৯৯৩ :২)।

খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতক থেকেই ভারতবর্ষে আর্যদের আগমন ঘটে। পরবর্তী এক হাজার বছরে অর্থাৎ পঞ্চম শতকে আর্যরা বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে তাদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আধিপত্য বিস্তার করে। আর্যরা ছিল উন্নত ভাষা ও সংস্কৃতির অধিকারী। আর তাই সহজেই তারা এ অঞ্চলের ভাষা ও সংস্কৃতির সাথে মিশে একদিকে যেমন শঙ্কর জাতি বাঙালির উদ্ভব ঘটে তেমনি বাঙালির সংস্কৃতিতে অনুপ্রবেশ করে আর্য উপাদান। এ সময় সংস্কৃত ছিল শিক্ষা বিদ্যা চর্চা এবং সাহিত্যের ভাষা। আর সাধারণ মানুষের মুখের বা কথ্য ভাষা ছিল প্রাকৃত। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রমুখ ভাষাবিজ্ঞানীর মতে নবম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে এই প্রাকৃত ভাষা থেকেই বাংলা ভাষার উদ্ভব। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন চর্যাপদ বা চর্যাগীতিকা কবিতা হিসেবে পরিচিত হলেও এটি মূলত গান। কেননা এর প্রতিটি পদের সংগে রাগ-রাগীনির উল্লেখ রয়েছে। আমরা আলোচ্য অভিসন্দর্ভে "নজরুল সংগীতে স্বদেশচেতনার স্বরূপ" আলোচনা করতে হাজার বছরের ঐতিহ্যময় বাংলা গানের মধ্যে স্বদেশভাবনা ও প্রেরণা অনুসন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে বিশ্লেষণ করতে চাই। আর তাই বাংলা ভাষার প্রথম নিদর্শন চর্যাপদ থেকে শুরু করেছি সংগত কারণেই।

## চর্যাপদ

পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১) নেপালের রাজ গ্রন্থাগার থেকে চর্যাগীতিকার পুঁথি উদ্ধার করে ১৯১৬ সালে তা "হাজার বছরের পুরান বাংলা ভাষার বৌদ্ধ গান ও দোহা" নামে প্রকাশ করেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে। আধুনিক বাংলা ভাষার সঙ্গে চর্যাপদের ভাষার বিস্তর পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এটি বাংলা ভাষায় রচিত কাব্য বা গীতি সংকলন তাতে সন্দেহ নেই। এই সংকলনটিতে সাড়ে ছেচল্লিশটি পদ ও তেইশ জন কবির নাম পাওয়া যায়। চর্যাগীতিকার গানগুলি যে সুর সহকারে গাওয়া হত তা বলাই বাহুল্য। এমনকি বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহারও ছিল বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। মূলত বৌদ্ধ সহজিয়া সম্প্রদায়ের সাধন-ভজন তত্ত্বের কথা সাঙ্কেতিক ভাষায় উপস্থাপন করা হলেও চর্যাগীতিকায় সেকালের বাঙালির প্রাত্যহিক জীবন এবং পারিপার্শ্বিক বিষয়াবলী ফুটে উঠেছে। "বৌদ্ধ ধর্মের নানা শাখা-প্রশাখা প্রভাবিত গূঢ় লৌকিক সাধনতত্ত্ব অবলম্বনে চর্যাগীতি রচিত। গানের সাংকেতিক ভাষায় উপেক্ষিত দরিদ্র জনসমাজের ছবিও অঙ্কিত রয়ে গেছে" (করুণাময় গোস্বামী: ১৯৮৫: ৯-১০) । পদকর্তাগণ এ গানগুলির মধ্যে বাংলার সমাজ ও বাঙালীর

Dhaka University Institutional Repository

সুখ দুঃখের যে ছায়াচিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন তার মধ্যে রয়েছে তাদের স্বদেশ ভাবনা এবং দেশপ্রেমের পরিচয়, যা অনেকটা প্রচ্ছন্নভাবেই ফুটে উঠেছে। আমরা চর্যাগীতির কিছু পদে স্বদেশ ভাবনার বা দেশপ্রেমের যে পরিচয় আছে তা তুলে দিচ্ছি। ১৪ নং চর্যায় আমরা পাই গঙ্গা যমুনা নদীর উল্লেখ এবং বাংলার এক শাশ্বত চিত্র —

গঙ্গা জাউনা, মাঝেঁ রে বহই নাঈ।
তহি বুড়িলী মাতঙ্গী পোইআ লীলে পার করেই ॥

৪৯ নং পদে আমরা পাই দস্যুরা এ দেশ লুট করে নিয়ে গেল ভুসুক বাঙালি হল আর তার গৃহিনীকে চণ্ডাল কেড়ে নিল।

অদঅ দঙ্গালে দেশ লুড়িউ ॥
আজি ভুসুক বাঙ্গালী ভইলী
নিঅ ঘরিণী চণ্ডালেঁ লেলী ॥

তৎকালীন বাংলার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক চিত্রের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের যে ছবি অঙ্কন করেছেন পদকর্তাগণ তা তাদের স্বদেশ প্রেমেরই পরোক্ষ পরিচয়বাহী। ৩৩ নং পদে আমরা পাই তেমনি একটি চিত্র।

টালত মোর ঘর নাহি প্রতিবেশী।
হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী ॥

অর্থাৎ পাহাড়ের ওপর আমার ঘর কোনো প্রতিবেশী নেই। হাড়িতেও ভাত নেই উপোশ করে থাকি তাই।

## শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

চর্যা পরবর্তী কালের উল্লেখযোগ্য সাহিত্য ও সংগীত নিদর্শন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। মূলত রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক লীলা কাহিনী নিয়ে কবি বড়ুচণ্ডী দাস এই আখ্যানগীতি রচনা করেছেন। এর রচয়িতা কবি বড়ুচণ্ডী দাস। ধারণা করা হয় গ্রন্থটি চৌদ্দ-পনের শতকে (সুকুরসেন: প্রথম খণ্ড পৃ: ১২১: ১ম খণ্ড) রচিত। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নামের মধ্যেই আভাসিত হয় এটি মূলত গীতিধর্মী আখ্যানকাব্য। এর প্রত্যেক গীতের উপরে সুর, তাল ইত্যাদি নির্দেশ দেয়া আছে। এই গ্রন্থে আপাতভাবে রাধা এবং কৃষ্ণের জাগতিক প্রণয়-লীলার বিস্তৃত বিবরণ থাকলেও এর নেপথ্যে রয়েছে রচয়িতার এক বিস্ময়কর দেশপ্রেমবোধ। কেন-না অত্যাচারী রাজা কংশকে দমন করতে ভগবানের মানব রূপে মর্তে আগমন ঘটে। এই ভগবানের অবতারই কৃষ্ণ। যদিও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কৃষ্ণের কংশ বধের আখ্যানকে ছাপিয়ে প্রণয় কাতরতাই বেশি ফুটে উঠেছে। তা সত্ত্বেও অত্যাচারের হাত থেকে দেশের মানুষকে রক্ষা করতে ভগবানকে অবতার রূপে মর্তে আনার পরিকল্পনা এবং তাকে মানবিক মাহাত্বে

*Dhaka University Institutional Repository*

অভিসিক্ত করার মধ্য দিয়ে কবি বড়ুচণ্ডী দাস তাঁর স্বদেশপ্রেমের পরিচয় ফুটিয়ে তুলেছেন। এ ছাড়াও এ গ্রন্থে ভগবান মানুষের ঔদাত্ত প্রেমের প্রতীকে ধুলিধূসর পৃথিবীর নর-নারীর মানবিক প্রণয় আখ্যান গীত আকারে প্রকাশিত হয়েছে। এমনকি মধ্যযুগের বাংলার প্রকৃতিও এখানে চিত্রায়িত হয়েছে। সেকালের "সাধারণ মানুষ এই কাহিনী এবং গানের মধ্যে তাদের অন্তরের অনুভূতির অনুরনণ খুজে পেয়েছিল" (প্রভাতকুমার গোস্বামী (সম্পা): ১৩৭৬: ৭)।

## মঙ্গলগীত বা মঙ্গলকাব্য

প্রধানত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পর থেকে (চৌদ্দ শতকের পর) বাংলাদেশে রচিত হয়েছে নানা বিষয় ভিত্তিক অসংখ্য মঙ্গলগীত। এগুলো দেবদেবীর গুণকীর্তনমূলক আখ্যানগীত হলেও এর মধ্যে সাধারণ মানুষের মঙ্গল আকাঙ্খা ধ্বনিত হয়েছে। গবেষক আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর 'মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' গ্রন্থে জানাচ্ছেন— মঙ্গল সুর থেকেই মঙ্গল নামের উৎপত্তি। আবার 'প্রাচীন মঙ্গল প্রবন্ধ গীতির নামানুসারে এই গানের 'মঙ্গল' নাম হয়ে থাকবে এমন অনুমান করাও যুক্তিযুক্ত। শার্ঙ্গদেব সঙ্গীত রত্নাকর-এ মঙ্গল ও মঙ্গলাচার প্রবন্ধগীতির উল্লেখ করেছেন। মঙ্গল প্রবন্ধ গান সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে এই গান কৌশিকী বা বোট্ট রাগে গেয়। এর পদ হয় মঙ্গল বা কল্যাণবাচিক, লয় বিলম্বিত' (করুণাময় গোস্বামী; ১৯৮৫; ১৮)। ত্রয়োদশ শতকের শুরুতে বাংলাদেশে তুর্কি আক্রমন হয়। এরপর থেকে প্রায় আঠারো শতক পর্যন্ত গীতিমূলক কাব্য রচিত হয়। বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র সহযোগে এগুলো সমবেত ভাবে গাওয়া হত। যেহেতু তুর্কি আক্রমন প্রতিহত করতে বাঙালিরা ব্যর্থ হয় তাই বীরত্বমূলক কাব্যের পরিবর্তে এসময় অসহায় মানুষ দেবতার কাছে প্রার্থনা করে আত্মশক্তি অনুসন্ধান করে। এদিক দিয়ে দেখলে মনে হবে এই কাব্যে কবিদের স্বদেশ ভাবনা তথা মানবিক বোধ কাজ করেছে। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে তাই আমরা পাই যুদ্ধে পরাজয় এবং দেশ উদ্ধারের স্বপ্নের কথা। শেষ পর্যন্ত ব্যাধরাজ কালকেতু নিজ রাজ্যে ফিরে এসে শান্তিতে বসবাস করতে থাকে। এই কাব্যে প্রজার প্রতি রাজার ডিক্রিদারের অত্যাচারের কথা যেমন আছে —

অধর্মা রাজার কালে প্রজার পাপের ফলে
ডিহিফার মামুদ শরীফ ॥

তেমনি সবলের কাছে দুর্বলের অসহায়ত্বের পরিচয় এবং আত্মরক্ষা বা অপমান সহ্যকরতে না পেরে চণ্ডীদেবীর কাছে পশুদের প্রার্থনা যেন বিদেশীদের আক্রমনে বাঙালির অন্তরের কথায় ফুটে উঠেছে।

Dhaka University Institutional Repository

কি করিব কোথা যাব কোথা গেলে তরি।
আপনার দন্ত দুটা আপনার অরি ॥
শূণ্ডে ধরি মহাবীর উপাড়ে দশন।
এত অপমান মাতা সহে কোন জন ॥

(চণ্ডীমঙ্গল কাব্য: কালকেতু ও ফুল্লরা উপাখ্যান)

এরপর আমরা কবি ভারতচন্দ্রের গীত অন্নদামঙ্গলে দেখি সন্তানের মঙ্গল কামনায় মা দেবীর কাছে প্রার্থনা করছেন, বর চাচ্ছেন—

প্রণামিয়া পাটুনী কহিছে জোড় হাতে।
আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে ॥

এভাবে একটু একটু করে বাংলা সঙ্গীত রচয়িতাগণ ব্যক্তি ভাবনা, সমাজ ভাবনা, মানবিক ভাবনা পার হয়ে অগ্রসর হয়েছে স্বদেশ ভাবনার দিকে। মঙ্গলগীতগুলো সমগ্র মধ্যযুগব্যাপী বিনোদনের উপকরণ হিশেবে কাজ করলেও এর মধ্যে বাঙালির প্রাত্যহিক আশা-আকাঙ্খা যে ধ্বনিত হয়েছে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

## শাক্ত পদাবলী

শ্রী চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে বাংলায় যে প্রেমধর্মের জোয়ার শুরু হয় তার পরিণতি বৈষ্ণব পদাবলী। এর ফলে বাংলায় রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক প্রণয়-লীলাগীতের প্রসার ঘটে। আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনার মধ্যেও এই গানগুলো প্রধানত রোমান্টিক। কিন্তু আঠারো শতকে এসে পদাবলীর সঙ্গীতের ভক্তিরস এক নতুন ধারায় প্রবাহিত হয় এর নাম শাক্ত পদাবলী বা শাক্তগীত। যেহেতু দেবী শ্যামা বা কালীর মাহাত্ম বর্ণনা হচ্ছে এই গীতধারার প্রধান বিষয় তাই একে শ্যামাসঙ্গীতও বলা হয়। শাক্তদের কাছে যেহেতু দেবীই পরমাত্মা শক্তির বিশ্বব্যাপিনীরূপ তাই তার কাছে কবিরা এই গানে শক্তি প্রার্থনা করেছেন— আত্মসমর্পন করেছেন। যে মায়ের কাছে এই আত্মসমর্পন তা কি শুধুই দেবী না দেশমাতৃকা সে প্রশ্নটিও মনে জাগে। কেন-না এই ধারার প্রধানতম কবি রামপ্রসাদ সেন (১৭২০-১৭৮১) লিখেছেন—

এমন দিন কি হবে মা তারা,
যবে তারা তারা বলে, তারা বেয়ে পড়বে ধারা ॥
হৃদি পদ্ম উঠবে ফুটে, মনের আঁধার যাবে ছুটে
তখন ধরাতলে পড়বো লুটে, তারা বলবে সারা ॥
ত্যাজব সব ভেদাভেদ ঘুচে যাবে মনের খেদ।
ওরে শত শত সত্য বেদ, তারা আমার নিরাকারা ॥

কিংবা

Dhaka University Institutional Repository

কুপুত্র অনেক হয় মা, কুমাতা নয় কখনো।
রাম প্রসাদের এই আশা মা, অন্তে থাকি পদানত ॥

কোন পটভূমিতে বাংলাদেশে শাক্ত পদাবলীর উদ্ভব হয়েছিল তা লক্ষ করা প্রয়োজন। মূলত তুর্কি-মোঘল শাসনের অবসান এবং ইংরেজদের আগমন ও ক্ষমতা লাভ এই যুগসন্ধির অত্যাচার-অরাজকতা তথা অনিয়মের কালে। তখন 'জীবনের সর্বক্ষেত্রে একটা অনিশ্চয়তার ভাব- অনিত্যতার ভাব। এই নিদারুন অবস্থা থেকে আত্মরক্ষার তাগিদেই শাক্ত গীতির জন্ম হয়েছিল এই যুগে। নিদারুন অত্যাচারের সম্মুখীন হবার সাহস যে মানুষ হারিয়েছে— চতুর্দিক ব্যাপী সংকটের মোকাবেলা করার শক্তি যার মধ্যে নেই সে স্বভাবতই এই ধরনের পথ বেছে নেবে। এবার আর আখ্যায়িকা নয় ছোট ছোট গীতির মধ্যদিয়ে মানুষের ব্যাথা-বেদনা আকুতি প্রকাশ পেল' (প্রভাতকুমার গোস্বামী; ১৩৭৬; ১৩)। এদিক দিয়ে শ্যামাসঙ্গীতের গুরুত্ব যথেষ্ট। কেননা, আখ্যানকাব্য বা বন্দনাগীত ছেড়ে খণ্ড গীতির মধ্যে কবিরা মা, মাটির প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেছেন। সবচেয়ে বড় কথা পদাবলীর আধ্যাত্মিকতা বা রোমান্টিকতা এখানে অনুপস্থিত।

রামপ্রসাদ ছাড়াও এ সময়ে আরো অনেকে শাক্তগীত রচনা করেছেন। এদের মধ্যে কমলাকান্ত ভট্টাচার্য (১৭৭২-১৮২১), দাশরথি রায় (১৮০৬-১৮৫৭), রসিক চন্দ্ররায় (১৮২০-১৮৯৩), রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় (১৭১০-১৭৮২), রঘুনাথ রায় (১৭৫০-১৮৩৬) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। তবে শ্যামাসঙ্গীতের প্রধান কৃতি কবি "রাম প্রসাদ তাঁর গানে দেবতা ও মানুষের মধ্যে ব্যক্তিতান্ত্রিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। পৌরণিক ভয়ঙ্করী কালীকে তিনি রূপায়িত করেছিলেন স্নেহবৎসলা মাতৃরূপে। তাঁর সঙ্গে ভক্তের সম্পর্ক হয়ে দাঁড়ায় গৃহস্থ ঘরের মা-ছেলের সম্পর্কের মতো। এই সংস্কার মুক্ত লোকায়ত ভক্তি প্রচারের সাহায্যে রামপ্রসাদ একদিকে যেমন উপাসনা সঙ্গীতকে অত্যন্ত অন্তরঙ্গ করে তুলেছিলেন। অন্যদিকে বাংলা কাব্যগীতিতে মানুষের অস্তিত্বকে প্রাসঙ্গিক করে তুলেছিলেন" (করুণাময় গোস্বামী: ১৯৮৫:২২)। এভাবে প্রথমে দেবতা, তারপর মানুষ এবং শেষে কবি সঙ্গীতকারদের মধ্যে জন্ম নেয় স্বদেশচেতনার। প্রাচীন ও মধ্যযুগের প্রকৃতি ও দৈব নির্ভর মানুষ আঠারো শতকে এসে প্রথম মানবিকবোধে উজ্জীবিত হয় এবং অল্পকিছু কালের মধ্যে সমাজের, জাতির দেশের ভাবনায় আন্দোলিত হয়ে স্বদেশ ভাবনার পরিচয় প্রকটিত করে তাঁর সৃজনশীল কর্মে।

## গ্রন্থপঞ্জি

১. করুণাময় গোস্বামী
১৯৮৫: বাংলা গান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

*Dhaka University Institutional Repository*

২. প্রভাতকুমার গোস্বামী (সম্পাদিত)

১৩৭৬; হাজার বছরের বাংলা গান; স্বারসত লাইব্রেরী; কলকাতা।

৩. বুদ্ধদেব রায়

১৯৯০; বাংলা গানের স্বরূপ; ফার্মা কে এল এম প্রা: লি: কলকাতা

৪. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী

১৯৯৩; বাংলা গানের ধারা; শিল্পকলা একাডেমী: ঢাকা।

৫. সুকুমার সেন

১৯৪০; বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স (৬ষ্ঠ সং-১৯৭৮): কলকাতা

৬. স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৯২; সমকালের বাংলা গান ও রবীন্দ্রসংগীত; প্যাপিরাস; কলকাতা।

৭. হেমাঙ্গ বিশ্বাস

১৩৮৫; লোকসঙ্গীত সমীক্ষা বাংলা ও আসাম: এ মুখার্জী এন্ড কোং প্রাঃ লিঃ; কলকাতা।

Dhaka University Institutional Repository

# বাংলাদেশে স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাস

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সামাজিক ঐক্য ও সংহতির মধ্য দিয়েই সে সমাজে টিকে থাকে। যে-কোনো সমস্যা-সংকট বিপদে তারা একযোগে কাজ করতে চায়। এভাবে মানব সমাজে সভ্যতার ধাপে ধাপে গোষ্ঠীচেতনা, জাতীয়তাবোধ এবং স্বদেশচেতনার উদ্ভব ঘটেছে। উনিশ শতকে ভারতবর্ষে জাতীয়তাবোধের স্ফূরণ ও প্রসার ঘটলেও গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ভূক্ত চেতনার উন্মেষ হয়েছে অনেক আগেই বিশেষ করে মধ্যযুগের তুর্কী-মোঘল শাসন আমলে এই চেতনায় উদ্বেলিত হয়ে অনেক স্থানীয় জমিদার, রাজা প্রমুখ বিদ্রোহ করেছে শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে। এ প্রসঙ্গে বাংলার বার ভূঁইয়াদের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তৎকালীন সময়ে এ ঘটনাগুলি বিচ্ছিন্ন ভাবে ঘটলেও ভারতবর্ষের ইতিহাস রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে ব্যক্তি স্বার্থের বাইরেও অনেকসময় গোষ্ঠী এবং জাতীয়চেতনা এর মধ্যে কাজ করেছে। আর তাই এ অঞ্চলের স্বদেশচেতনার ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গেলে এ প্রসঙ্গগুলো উল্লেখের দাবি রাখে। বৃটিশ শাসন আমলের শুরুতে আঠার শতকের শেষ দিকে এ অঞ্চলে যে ফকির বা সন্নাসি বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল সেখানেও আমরা লক্ষ করেছি গোষ্ঠীচেতনার পরিচয়। তৎকালীন ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির সংগে যুদ্ধ করতে "মীর কাশিম ফকির সন্নাসীদের আহবান করিয়া ছিলেন এবং তাদের ডাকে সাড়া দিয়া ফকির-সন্নাসীরা তাহার পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিল। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া মীর কাশেম পলায়ন করেন কিন্তু ফকির-সন্নাসীরা তাহাদের বৃটিশ বিরোধী তৎপরতা অব্যাহত রাখে। এর কারণ, ইংরেজ সরকার তাহাদের অবাধ গতিবিধিতে বাধা সৃষ্টি করে, ভিক্ষা ও মুষ্টি সংগ্রহকে বে-আইনী বলে ঘোষণা করে, ডাকাত দস্যু বলিয়া আখ্যায়িত করে। সরকার তাহাদের দমনের জন্য জমিদারদের সহযোগিতা কামনা করে। ইতিপূর্বে কোন সরকার তাহাদের কর্মকান্ডে এমন বাধা সৃষ্টি করে নাই। অতএব এমন তরো সরকারের পতন ঘটানোর প্রতিজ্ঞা নিয়া এক দীর্ঘ সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হয় ফকির ও সন্নাসীরা। ফকির দলের নেতৃত্ব দেয় ফকির মজনু বুরহানা। সন্নাসীদের নেতৃত্ব দেন ভবানী পাঠক" (মুহম্মদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য: ১৯৯৮; ৩৯৮)

স্বদেশচেতনার বহুমুখী দিকের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে জাতীয়তাবোধ। এই জাতীয়তাবোধ প্রভাবিত করেছিল বৃটিশ শাসিত ভারতবর্ষের মানুষের জীবন আচরণ এবং সংস্কৃতিক কর্মকান্ডকে। এর ফলে একদিকে যেমন স্বদেশী-আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, অন্যদিকে সংগীত ও সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রতিবাদ মুখর ভারতবাসীর এক নতুন পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়। একদিকে রচিত হয়েছে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীল দর্পনের' মতন প্রতিবাদী নাটক অন্যদিকে স্বদেশীসংগীত।

"উনিশ শতকের শেষার্ধে ভারতবর্ষে বিশেষ কতকগুলি কারণে এই জাতীয়তাবোধের স্ফূরণ ও প্রসার ঘটতে থাকে। ইংরেজ শাসনে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ,

*Dhaka University Institutional Repository*

পোস্ট অফিস প্রভৃতির সহায়তায় এই বিশাল উপমহাদেশের বিভিন্ন অংশে যাতায়াতের সুবিধা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রবর্তনা এ ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। ইংরেজ ভারতবর্ষের বংশভিত্তিক বৃত্তিগত অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙ্গে দিয়ে সামাজিক ব্যবস্থায় যে বিপর্যয় নিয়ে আসে তাতে জীবিকার নতুন শর্তেই জাতীয়চেতনার বীজ অঙ্কুরিত হতে থাকে। বিভিন্ন প্রজা বিদ্রোহ ও ইংরেজের নিপীড়ন যেমন সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা প্রতিবাদী ঐক্যগড়ে ওঠে, তেমনি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও অবদমনের বিরুদ্ধে জাতীয়তার উন্মেষ ঘটতে থাকে" (সীমা বন্দ্যোপাধ্যায়: ১৯৮৬: ১)।

আর এর ফলে বিটন এর ব্লাক বিল পরাজয় (১৮৫০), পশ্চিম বঙ্গের সাওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫), সিপাহী বিদ্রোহ (১৮৫৭), নীল বিদ্রোহ (১৮৬০) প্রভৃতি সামাজিক আন্দোলনের মধ্যে দেখা গেছে জাতীয়চেতনার স্ফুরণ। কখনও কখনও কোনো কোনো ব্যক্তিও জাতীয় বা স্বদেশচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বিভিন্ন আন্দোলন সামাজিক, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে পালন করেছেন অগ্রণী ভূমিকা। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন— রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১), মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩), রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৮৯৯), রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৮৭), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪), জোতিরিন্দ্রনাথ (১৮৪৯-১৯২৫), রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১), দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩), কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) প্রমুখ।

মূলত বৃটিশ শাসন আমলে এদেশের বিভিন্ন গোষ্ঠী-সম্প্রদায় এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে যে ক্ষোভ দানা বেধে ওঠে তারই প্রতিক্রিয়ায় দেখা যায় কৃষক বিদ্রোহ, সিপাহী বিদ্রোহ প্রভৃতি। এবং এগুলো ক্রমান্বয়ে জাতীয় বিদ্রোহের রূপ পরিগ্রহ করতে থাকে। (নেপাল মজুমদার, ১৯৯৫: ২-৩) ফলে দেশপ্রেমিক সচেতন শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে এই আন্দোলনকে অনুপ্রাণিত করতে নানা সামাজিক-সংস্কৃতিক কার্যক্রম সম্পৃক্ত হতে দেখা যায়। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল একটাই আর তা হচ্ছে বিদেশী শাসন নিপীড়নের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করা।

আর এ জন্যই ১৮৫১ সালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় দি ন্যাশনাল এসোসিয়েশন বা 'দেশহিতার্থী সভা'।

এই সময়ে রচিত কিছু কিছু সাহিত্যের মধ্যেই স্বদেশ ভাবনা কাজ করেছে বিশেষ করে মাইকেল মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য' (১৮৬১) এবং 'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬১) নাটকে পরাধীনতার গ্লানি ও বেদনা ফুটে উঠেছে। অন্যদিকে কবি রঙ্গলাল তাঁর 'পদ্মিনী উপাখ্যানে' (১৮৫৮) লিখেছেন-

স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
কে বাঁচিতে চায়,
দাসত্ব শৃঙ্খল বলকে পরিবে পায় হে

Dhaka University Institutional Repository

কে পরিবে পায় ॥

প্রায় কাছাকাছি সময়ে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীল দর্পন' নাটক (১৮৬০) রচিত হয়। নীল চাষকে কেন্দ্র করে নীল কুঠির সাহেবদের অত্যাচার এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ছিল এ নাটকের প্রধান বিষয়। অত্যাচারিত বাঙালিকে ঐক্যবদ্ধ করতে এ নাটকটি সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল। যে কারণে বৃটিশ সরকার নাটকটি নিষিদ্ধ করতে বাধ্য হয়। আরো পরে কিরণচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের 'ভারতমাতা' (১৮৭৩), হরলাল রায়ের 'বঙ্গের সুখবসান' (১৮৭৪), জ্যোতিরিন্দ্র নাথের পুরুষবিক্রম (১৮৭৪) প্রভৃতি নাটকে স্বদেশচেতনার অভিব্যক্তি লক্ষ করা গেছে। এ প্রসঙ্গে ১৮৮২ সালে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'আনন্দ মঠ' উপন্যাসের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। বৃটিশ বিরোধী সন্ন্যাসি বিদ্রোহই এ উপন্যাসের মূল আখ্যান।

সাহিত্যের পাশাপাশি সামাজিক ভাবে জাতীয়তাবাদী তথা স্বদেশী আন্দোলনের নেতৃত্বে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে রাজনারায়ণ বসুর নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি ১৮৬৬ সালে 'স্বজাতীয় ভাব ও স্বদেশানুরাগ সঞ্চারিনী সভা' (A society for promotion of national feeling among the Educated Natives of Bangal) প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া 'হিন্দুমেলা' প্রতিষ্টার পেছনেও তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। তবে উনিশ শতকে স্বদেশী-আন্দোলনের নেপথ্যে নানা কারণ সম্পৃক্ত। এর মধ্যে ১৮৮০ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা, রেল যোগাযোগ স্থাপন, নীল বিদ্রোহ, সাওতাল ও সিপাহী বিদ্রোহ এবং নিষ্ঠুর হাতে শাসক কর্তৃক তা দমন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বিশ শতকের শুরুতেই ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে শুরু হয় স্বদেশী-আন্দোলন। আর এই আন্দোলন মূলত দানা বেধে ওঠে ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আইন পাশের কারণে। সে সময়ের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের স্রোতে সারা জাতির মধ্যে বিপুল সাড়া পড়ে যায়। কিন্তু জাতির আবেগ ও মতামতকে উপেক্ষা করে বাংলাদেশকে যখন বৃটিশ শাসকরা দ্বিখণ্ডিত করে তখন 'বাংলার নিহিত শক্তি যেন সহসা আত্মপ্রকাশ করিল। কবি, বক্তা, চিত্রকরণ, সংবাদপত্র সেবক, গায়ক, যাত্রাওয়ালা, যিনি যে রূপে পারিলেন, মাতৃসেবার মহাযজ্ঞে যোগ দিলেন। বাংলা তখন জাগিয়াছে' (হরিনাথ মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায় ; ১৯৭৬: ৩১)।

এই বঙ্গভঙ্গের কারণে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে তখন যেন সমগ্র জাতি জেগে ওঠে এক নতুন উদ্দীপনায়। শুরু হয় বাঙালির সম্মিলিত প্রথম অভিনব সংগ্রাম। সমাজের উচ্চ শ্রেণী থেকে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত এই প্রতিবাদ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। এই নবজাগরণের ঢেউ স্পর্শ করে তৎকালীন শিল্প, সাহিত্য ও সঙ্গীতকে। সে সময়ে মাতৃভূমি ও স্বদেশবাসীর উদ্দেশ্যে বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ রচনা করলেন তাঁর বিখ্যাত গান—

*Dhaka University Institutional Repository*

বাংলার মাটি বাংলার জল
বাংলার বায়ু বাংলার ফল —
পূণ হউক, পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক, হে ভগবান ॥
বাঙালীর প্রাণ, বাঙালীর মন, বাঙালীর ঘরে যত ভাই বোন-
এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান ॥

১৯০৬-৭ সাল থেকে শুরু হয় বিদেশী দ্রব্য বয়কটের স্বদেশী আন্দোলন। এবং এক পর্যায়ে বিদেশী শাসন বর্জনের জাতীয় আন্দোলনের রূপ লাভ করে স্বাধীনতার স্বপ্নে অনুপ্রাণীত করে তোলে বাঙালীকে। ১৯১০ সালে প্রেস আইন পাস করে হরণ করা হয় সংবাদপত্র ও প্রকাশনার স্বাধীনতা এবং ১৯১৯ সালের ১০ এপ্রিল জনগণের আন্দোলন ও প্রতিবাদে উদ্বিগ্ন হয়ে বৃটিশ সরকার মার্শল'ল জারি করেন। এর দুদিন পর ১৩ এপ্রিল ঘটে জালিয়ানওয়ালাবাগের সেই অমানবিক বর্বরচিত ঘটনা। পুলিশের গুলিতে মারা যায় ৩৭৯ জনের অধিক। এ সমস্ত ঘটনা গভীর ভাবে রেখাপাত করে সে সময়ের বাঙালির মধ্যে। ১৯২১ সালে তাই মহাত্মা গান্ধীর প্রবর্তিত 'অসহযোগ আন্দোলন' সর্বভারতীয় রূপ ধারণ করে। যদিও এ আন্দোলন শেষ পর্যন্ত সফল হতে পারেনি তা সত্ত্বেও অহিংসা নীতির মানবীয় মন্ত্রে উজ্জীবিত করে তুলেছিল সেদিন ভারতবাসীকে। এ সমস্ত সামাজিক-রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ গভীর ভাবে তাড়িত করেছে দেশপ্রেমিক কবি শিল্পীদেরকে। তাই রবীন্দ্রনাথের পর কাজী নজরুল ইসলাম এক নতুন উদ্দীপনায় স্বদেশপ্রেমমূলক সঙ্গীত রচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। যা পরবর্তী কালের ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বপক্ষের আন্দোলন এবং গণমানুষের জাগরণে পালন করেছে গুরুত্বপূর্ণ এবং উল্লেখযোগ্য ভূমিকা।

## গ্রন্থপঞ্জি

১. করুণাময় গোস্বামী
১৯৯৩: বাংলা গানের বিবর্তন: বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

২. রফিকুল ইসলাম
১৯৭২: নজরুল জীবনী: বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ঢাকা

৩. মুহম্মদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য লেখক
১৯৯৮; বাংলাদেশের ইতিহাস: স্টুডেন্ট ওয়েজ; ঢাকা

৪. মুজাফ্ফর আহমেদ
১৯৬৫; কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা; মুক্তধারা (৩য় সং-১৯৮৭); ঢাকা

৫. শান্তি সিংহ (সম্পাদিত)
১৯৮৮; স্বদেশ আমার; নিউ বেঙ্গল প্রেস; কলকাতা

৬. সীমা বন্দ্যোপাধ্যায়
১৯৮৬: রবীন্দ্রসংগীতে স্বদেশচেতনা: গণমন প্রকাশনী; কলকাতা

Dhaka University Institutional Repository

# নজরুল পূর্ববর্তী বাংলা গানে স্বদেশচেতনা

বাংলা সঙ্গীতের হাজার বছরেরও অধিক কালের ঐতিহ্যের ধারায় স্বদেশচেতনামূলক গান, বা স্বদেশী গান কিংবা বলতে পারি দেশাত্মবোধক গানের স্থান নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। এর আগে অবশ্য স্বদেশচেতনামূলক গান বলতে আমরা কোন গানগুলোকে বুঝবো তা স্পষ্ট করা উচিত। স্বদেশ বলতে শুধু ভৌগোলিক সীমা-ই বোঝায় না। সেই সঙ্গে দেশের ইতিহাস, স্বাধীনতা, ঐতিহ্য, প্রকৃতি, কৃতিসন্তান, বীর, প্রাকৃতিক সম্পদ, সর্বপরি আত্মমর্যাদা ও মানবিক বোধকেও বোঝানো হয়। আর "যে গানে দেশবাসীর মনে দেশের ও দশের প্রতি ভালবাসা জাগায়, স্বদেশের প্রতি মমত্ববোধ তুলে ধরে— জাতির গৌরবময় ইতিহাস বর্ণিত হয়, একতার সৌধ গড়ে তোলে, মহৎ কার্যে আত্মোৎসর্গের আহ্বান দেয় তাই হল স্বদেশী গান" (বুদ্ধদেব রায়: ১৯৯০: ৬৯)

তুর্কি-মুঘল আমলে এদেশ বিদেশী শাসন-শোষণে বাধা পড়লেও রাজনৈতিক বিচক্ষণতা এবং সমাজধর্মীয় কারণে মুসলিম রাজা-বাদশাহগণ মিশে গিয়েছিলেন এদেশের সঙ্গে একান্ত হয়ে। আর সে কারণেই দেশবাসীর মনে পরাধীনতার ভাবনা তৈরি হয়নি কিংবা তৈরি হলেও তা প্রকাশ পায়নি। এর অন্যতম কারণ অবশ্য কৃষিনির্ভর এ দেশের জলবায়ু-আবহাওয়া, যোগাযোগ ব্যবস্থা তখন মোটেই ভাল ছিল না। পাশাপাশি শিক্ষা ও আত্মসচেতনতার আলো তখনো স্পর্শ করতে পারেনি। কিন্তু ইংরেজ শাসনের ব্যাপারটি প্রথম থেকেই দেশবাসী মেনে নিতে পারেনি। তাছাড়া তাদের অত্যাচার এবং নানাবিধ সামাজিক রাজনৈতিক ঘটনা সাধারণ মানুষের মধ্যে পরাধীনতার শিকল ছেঁড়ার অনুভূতি জাগিয়ে তোলে। এর ফলে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ভাবে যেমন নানা আন্দোলন দানা বেধে ওঠে (পূর্ববর্তী অধ্যায়ে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে) তেমনি শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীতেও এর ছায়াপাত ঘটে। আর তাই বলা যায় ইংরেজ শাসন-শোষণ-অত্যাচার থেকেই প্রকৃত পক্ষে জন্ম হয়েছে স্বদেশচেতনামূলক গান। মূলত উনিশ শতক থেকেই এই দেশপ্রেমমূলক গান ক্রমে ক্রমে বিকশিত হয়ে বিশ শতকে তার বহুবিধ শাখা বিস্তারিত করেছে। বাংলা সঙ্গীতের একজন উল্লেখযোগ্য গবেষক করুণাময় গোস্বামী দেশপ্রেমমূলক গানের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে লিখেছেন—

> পরাধীনতার বেদনা, স্বাধীনতার আকাঙ্খা, ইংরেজদের শোষণ, দেশের আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাবলম্বনের কামনা, বিদেশী পণ্য বর্জন, স্বদেশী দ্রব্যের পৃষ্ঠপোষকতা, পূর্ব গৌরব চৈতন্য, জন্মধন্যতাবোধ, মাতৃভূমির নৈসর্গিক শোভাবর্ণনা, মাতৃভাষা প্রীতি, সাম্প্রদায়িক ঐক্য, স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম ও আত্মোৎসর্গের আহ্বান, শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার আকুতি— দেশপ্রেম

*Dhaka University Institutional Repository*

> সম্পৃক্ত ইত্যাদি নানা বিষয় অবলম্বনে কালক্রমে এই সংগীত ধারা পরিপুষ্টি লাভ করে। এর মূল অনুপ্রেরণা ছিল রাজনৈতিক। ইংরেজ শাসনের সঙ্গে সংঘর্ষে এসে এই রাজনৈতিক প্রেরণার উৎপত্তি ঘটে। (বাংলা গান; ১৯৮৫: ৩৭)

এখানে একটি কথা বলে নেওয়া ভাল যে লোকসঙ্গীতের সঙ্গে দেশাত্মবোধক গানের স্বভাবগত মিল থাকলেও উভয়ের উৎস ও উদ্দেশ্য ভিন্ন। একটি ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ব্যাথা-বেদনা কিংবা আনন্দের গান অন্যটি দেশের-ভাষার গৌরব-গাথা, অতীত ঐতিহ্য ভাবনা, নিসর্গ-বর্ণনা জাতির পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙ্গা এবং স্বরাজের স্বপ্নের গান। একটির উদ্দেশ্য অবসর বিনোদন অন্যটির দেশবাসীকে সচেতন ও ঐক্যবদ্ধ করা। লোক-সঙ্গীতের উৎস লোকমানুষের দৈনন্দিন জীবন-সংগ্রাম, অন্যদিকে দেশাত্মবোধক গানের মূল উৎস ভারতবর্ষে বৃটিশের শাসন-শোষণ-অত্যাচার। প্রথমটির যাত্রা শুরু হয় সেই প্রাচীন-মধ্য যুগে, দ্বিতীয়টির সূচনা উনিশ শতকে। বাংলায় দেশাত্মবোধক সঙ্গীত রচনার সূচনা হিশেবে উল্লেখ করতে পারি কবি রামনিধি গুপ্তের (১৭৪১-১৮৩৯) 'নানান দেশের নানান ভাষা/ বিনে স্বদেশীয় ভাষা পুরে কি আশা' এই গানটি। এরপর উল্লেখ করা যায় রাজা রামমোহন (১৭৭২-১৮৩৩)-এর 'কি বিদেশে কি স্বদেশে যথায় তথায় থাকি' গানটি এবং কবি রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়ের (১৮২৭-৮৭) 'পদ্মিনী উপাখ্যান' (১৮৫৮) কাব্যের— 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়' সঙ্গীতটি। এই গানটি স্বদেশচেতনার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। প্রায় কাছাকাছি সময়ে দীনবন্ধু মিত্রের (১৮২৯-১৮৭৩) রচিত গানটিতে প্রতিফলিত হয়েছে নিষ্ঠুর নীলকরদের অত্যাচারের কথা। এ গানটিতে খুব তীব্র ভাবে না হলেও সে সময়ে কৃষক সমাজের জাতীয় বেদনা যেন ভাষা পেয়েছে—

> হে নিরদয় নীলকরগণ
> আর সহেনা প্রাণে এ নীলদাহন।
> দাহনের সুকৌশলে, শ্বেত সমাজের বলে
> লুটেছে সকল তোহে, কি আর আছে এখন।

একই বিষয় ও বক্তব্য নিয়ে কবি বিদ্যাভূনীর একটি গান পাওয়া যায়। দেশাত্মবোধক গান হিশেবে এটি তৎকালে বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছিল—

> নীল বানরে সোনার বাংলা করলে এবার ছারখার
> অসময়ে হরিশ ম'লো লং-এর হল কারাগার ॥
> প্রজার আর প্রাণ বাঁচানো ভার ॥

১৮৬৭ সালে কলকাতায় ঠাকুর পরিবারের পৃষ্ঠপোষকতায় শুরু হয় 'হিন্দুমেলা', স্বদেশী ভাবনা এবং স্বদেশীয়দের উন্নতি সাধনের অনুপ্রেরণা মূলত এই মেলাকে কেন্দ্র করেই গড়ে

*Dhaka University Institutional Repository*

ওঠে। দেশী দ্রব্যের পাশাপাশি দেশীয় সাহিত্য-সঙ্গীত সাধনার বিষয়ে এই মেলা উৎসাহ প্রদান করে। মেলা উপলক্ষে রচিত দেশাত্মবোধক গানগুলো এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই মেলার অন্য নাম জাতীয় মেলা বা চৈত্রমেলা। হিন্দু মেলার সম্পাদক ছিলেন গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সহকারী সম্পাদক নবগোপাল মিত্র। ১৮৬৮ সালে হিন্দুমেলার দ্বিতীয় বৎসরের অধিবেশনে দুটি স্বদেশী গান গাওয়া হয়। প্রথমটির রচয়িতা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি লিখেছিলেন —

মিলে সবে ভারত সন্তান, এক তান মন প্রাণ
গাও ভারতের যশোগান।

এই গানের সূত্র ধরেই দ্বিতীয় অধিবেশনে গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত আট চরণের একটি গান গাওয়া হয়। বলা বাহুল্য এটিও ছিল স্বদেশচেতনার গান —

লজ্জায় ভারত যশ গাইব কি করে।
লুটিতেছে পরে এই রঙের আকরে ॥
সাধিলে রতন পাই তাহাতে যতন নাই।
হারাই আমোদে মাতি অবহেলা করে ॥

১৪ বছর স্থায়ী হিন্দু মেলায় প্রত্যেক বৎসর এরূপ অধিবেশনে সঙ্গীত পরিবেশন করা হত যা মূলত স্বদেশ ভাবনার গান। ১৮৭৬ সালে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় হিন্দুমেলার গানগুলো নিয়ে একটি সংকলন প্রকাশ করেন যার নাম দেয়া হয় 'জাতীয় সঙ্গীত'। এই সময়ের আরো কিছু উল্লেখযোগ্য দেশাত্মবোধক গান হচ্ছে —

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের —

এক সূত্রে বাধিয়াছি সহস্রটি মন। (পুরুষ বিক্রম, ২য় সংস্করণ: ১৮৭৯)

নবীনচন্দ্র সেনের —

চাহিনা স্বর্গের সুখ নন্দন কানন।
মুহূর্তেক পাই যদি স্বাধীন জীবন ॥ (পলাশীর যুদ্ধ: ১৮৭৬)

বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত গান—

বন্দে মাতরম্
সুজলাং সুফলাং মাতরম।

মনোমোহন বসুর লেখা —

দিনের দিন সবে দীন ভারত হয়ে পরাধীন
অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তাজ্বরে জীর্ণ,
অনশনে তনুক্ষীণ।

Dhaka University Institutional Repository

গিরিশচন্দ্র ঘোষ লিখেছেন —

নয়ন জলে গেঁথে মালা পরাব দুখিনী মায়।
ভক্তি-কমল-কলি দিব মায়ের রাঙ্গা পায়॥

দ্বারকানাথ ঠাকুর রচিত গান— —

না জাগিলে সব ভারত ললনা
এ ভারত আর জাগে না জাগে না।

স্বর্ণকুমারী দেবীর গান —-

শত কণ্ঠে কর গান জননীর পূত নাম,
মায়ের রাখিব মান— লয়েছি এ মহব্রত।

ভারত মাতার জয়গানের পরিবর্তে একটু ব্যতিক্রমধর্মী সঙ্গীত রচনা করেছেন কবি গোবিন্দদাস - —

স্বদেশ স্বদেশ কচর্ছ কারে? এ দেশ তোমার নয়;
এই যমুনা গঙ্গা নদী, তোমার ইহা হত যদি?
পরের পণ্যে, গোরা সৈন্যে জাহাজ কেন বয়?

এরপর বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫)কে কেন্দ্র করে স্বদেশী আন্দোলনের যুগে দেশাত্মবোধক গান রচনার যেন প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়েছিল। প্রায় সব কবি শিল্পীরাই তখন এই ধারায় গান রচনা করে সমৃদ্ধ করে তোলেন বাংলা স্বদেশচেতনার গানকে। 'এ যুগে এত গান লেখার স্বাভাবিক কারণও রয়েছে। নিজ হৃদয়ের আবেগ, প্রেরণা অপরের হৃদয়ে পৌঁছে দেবার সরল পথটি হল সঙ্গীত। তাই সে যুগে অখ্যাত অসংখ্য গীতিকার গান রচনার কাজে এগিয়ে এসেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেন, অতুলপ্রসাদ সেন, কাজী নজরুল— এরা তো আছেনই; এদের সঙ্গে নাম করা যেতে পারে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালী প্রসন্ন, কামিনী ভট্টাচার্য, সরলা দেবী, অশ্বিনীকুমার দত্ত, মুকুন্দ দাস, নবীনচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী, দেবেন্দ্রনাথ সেন, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, গোবিন্দ্রচন্দ্র দাশ, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, রাজকৃষ্ট রায়, বরদাচরণ মিত্র। তালিকা এখানেই শেষ নয়। আজকের দিনে স্বদেশী গান রচয়িতাদের একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা তৈরী করাও মুস্কিল। কারণ বহু গানই আজ হারিয়ে গেছে' (প্রভাতকুমার গোস্বামী; ১৩৭৬; ৩১)।

এ কথা স্বীকার করতেই হয় বাংলা দেশাত্মবোধক গানের ক্ষেত্রে কবি গুরু রবীন্দ্রনাথের অবদান অসাধারণ। তাই তাঁর গানের বিষয়ে পৃথক আলোচনায় যাবার আগে আমরা অন্যদের গান সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা আবশ্যক বলে মনে করি। 'এই যুগে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অতুলপ্রসাদ সেন ও রজনীকান্ত সেনের দেশাত্মবোধক গান স্বদেশীবোধ জাগিয়ে তুলতে অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) সে সময়ে

*Dhaka University Institutional Repository*

রচিত 'ধন ধান্য পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা', 'বঙ্গ আমার জননী আমার', 'সেদিন সুনীল জলধী হইতে' প্রভৃতি গান দ্বারা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে গভীর ভাবে অনুপ্রাণীত করেন' (করুণাময় গোস্বামী: ১৯৮৫: ৪২)। ডি এল রায়ের স্বদেশী গানগুলো বাংলা গানের সীমাকে যেন সম্প্রসারিত করেছে। একই সঙ্গে সন্ত্রাসের বলিষ্ঠতা এবং মায়ের কোমলতা সহবস্থান করেছে তাঁর গানে। অন্যদিকে রজনীকান্ত সেন (১৮৬৪-১৯১০) তাঁর গানে স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের প্রতি জনতাকে উদ্দীপ্ত করেছেন, অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। তাঁর গানে দেশপ্রেমের ভাব একটু প্রচ্ছন্ন যেন। তার দুটি বিখ্যাত গান সে সময়ে খুব নন্দিত হয়েছিল —

১. মায়ের দেয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নেরে ভাই:
দিন-দুঃখিনী মা যে তোদের
তার বেশি আর সাধ্য নাই।

২. জয় জয় জনম ভূমি, জননী !
যাঁর, স্তন্য সুধাময় শোনিত ধমনী;

এরপর যাঁর গানের কথা উল্লেখ না করলেই নয় তিনি অতুলপ্রসাদ সেন (১৮৭১-১৯৩৪)। তিনি দেশী-বিদেশী নানা সুরে ও ঢঙে রচনা করেন বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য বাংলা দেশাত্মবোধক সঙ্গীত। তাঁর গানে অতীতের সমৃদ্ধ বাংলার স্মৃতি, সাম্প্রদায়িক ঐক্য এবং মাতৃভাষা প্রীতি লক্ষ করা যায়। দেশচেতনা, মাতৃভাষা চেতনায় তাঁর সর্বকালীন উল্লেখযোগ্য গানটি হচ্ছে—

মোদের গরব মোদের আশা
আ মরি বাংলা ভাষা।

এছাড়া —ওঠো গো ভারত লক্ষী, বল বল সবে, কোথা ভানু কোথা লুকালে উল্লেখ্যযোগ্য।

এ সময়ে রচিত দেশাত্মবোধক গানের আরও দুজন উল্লেখযোগ্য গীতিকার হচ্ছেন কালীপ্রসন্ন কাব্য বিশারদ (১৮৬১-১৯০৭) এবং চারণকবি মুকুন্দ দাস (১৮৭৮-১৯৩৪)। সম্পাদক কবি কালীপ্রসন্ন বঙ্গভঙ্গের আগেই দেশাত্মবোধক গান লিখে জনপ্রিয় হয়েছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য ও জনপ্রিয় গানগুলোর মধ্যে রয়েছে—

১. মাগো যায় যেন জীবন চলে
২. এক দেশে থাকি এক মাকে ডাকি
৩. স্বদেশের ধুলি স্বর্ণরেণু বলি। প্রভৃতি।

কবি মুকুন্দ দাস নিজে সরাসরি স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং দেশাত্মবোধক গান রচনা করে এমনকি যাত্রাপালা রচনা করে মানুষকে স্বদেশচেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

গানে তিনি সাম্প্রদায়িক ঐক্যের আহ্বানও জানিয়েছেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পরবর্তী ১২ বৎসরের মধ্যেই অনেক বিখ্যাত সঙ্গীতকারের মৃত্যু ঘটে ফলে সে সময়ে— 'মায়ের নামে বাদাম উড়িয়ে দেবে', 'ভরসা মায়ের চরণতরী আমরা এবার হবই পার', 'ভয় কি মরণে রাখিতে সন্তানে' ইত্যাদি গান নিয়ে মুকুন্দ দাস টিকে ছিলেন ভাটা পড়া দেশাত্মবোধ গানের সেই যুগে। কেননা তখনও নজরুলের আবির্ভাব ঘটেনি এবং রবীন্দ্রনাথ মনোনিবেশ করেছেন অন্যধারার সঙ্গীতে।

বাংলা সঙ্গীতের যে-কোনো ধারায়-ই রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১-১৯৪১) প্রতিভা এবং সাফল্যের কথা অনিবার্যভাবে এসে পড়ে। তাঁর সঙ্গীতের সঙ্গে বলা যায় বাংলাদেশের প্রায় পঞ্চাশ বছরের আন্দোলন জড়িয়ে আছে। শৈশবে যেমন পারিবারিক পরিবেশে তিনি পেয়েছিলেন সঙ্গীতের সাহচর্য তেমনি 'হিন্দুমেলা' তাঁকে অনুপ্রাণীত করেছিল দেশাত্মবোধক গান রচনা করতে। তাঁর স্বদেশচেতনামূলক গানে বিদ্রোহ নেই, শৃঙ্খল ভাঙ্গার আহ্বান নেই কিন্তু স্বদেশের মাহাত্ম এবং তার অতীত গৌরবের কথা আছে; আছে হতাশার ও দীর্ঘশ্বাসও।

বিশ শতকের সূচনায় (১৯০৫) সালে বঙ্গভঙ্গ শুরু হয়. তার অনেক আগে থেকেই রবীন্দ্রনাথ স্বদেশপ্রেমের গান রচনা করেছেন। মাত্র ষোল বৎসর বয়সে (১৮৭৭) তিনি রচনা করেছিলেন—

'তোমার তরে মা, সঁপিনু এ দেহ'। 401288

স্বদেশী গান রচনা করে দেশবাসীকে উদ্বোধিত করার ক্ষেত্রে বলা যায় রবীন্দ্রনাথের অবদান সর্বাপেক্ষা বেশি' (সীমা বন্দ্যোপাধ্যায়;১৯৮৬ : ৩৭)। শুধু গানের সংখ্যা বিচারেই নয় গানের গুরুত্বের দিক থেকেও রবীন্দ্রনাথের অবস্থান উপরে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের একজন গবেষক সীমা বন্দ্যোপাধ্যায় (পূর্বোক্ত) দেখাচ্ছেন এই ধারায় রবীন্দ্রনাথের গানের সংখ্যা ৭৮টি। যদিও রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় গীতবিতান ১ম ও ৩য় খণ্ড মিলিয়ে এই সংখ্যা ৬৩ বলে উল্লেখ করেছেন।

গানের সংখ্যা সে যাই হোক বলা যায় 'বঙ্গভঙ্গ যুগেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর অধিকাংশ উল্লেখযোগ্য দেশাত্মবোধক গান রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথের এই সব গানের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে তাতে আন্দোলনের সাময়িক উদ্বেলতা অপেক্ষা দেশ প্রেমের চিরন্তন ভাবটি রূপায়িত অনেক বেশি। তাই এসব গান নির্দিষ্ট আন্দোলনোত্তীর্ণ ও কালোত্তীর্ণ মহিমা লাভ করেছে (করুণাময় গোস্বামী; ১৯৮৫: ৪২)। ১৯০৫ সালের ৭ আগষ্ট কলকাতার শোভাযাত্রায় এবং টাউন হলের প্রতিবাদ সভায় গাওয়া হয় তাঁর বিখ্যাত গান— 'একবার তোরা মা বলিয়া ডাক', 'আমার সোনার বাংলা' প্রভৃতি গান। এবপর ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গের পরিণতির দিন রাখীবন্ধন উৎসবে পরিবেশিত হয় রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ-চেতনামূলক একটি উল্লেখযোগ্য গান—

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

*Dhaka University Institutional Repository*

বাংলার মাটি বাংলার জল বাংলার বায়ু বাংলার ফল;
এক হউক এক হউক এক হউক হে ভগবান।

'রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বদেশী সঙ্গীতে মাতৃভূমি, মাতৃভাষা স্বদেশের প্রতি অনুরাগ— এগুলিকে সুস্পষ্টভাবে রূপ দিয়েছেন। তাঁর সঙ্গীতে উগ্র দেশপ্রেম নেই। কিন্তু তবুও আঘাত-সংঘাতের মধ্যে দাড়িয়ে মাঝে মাঝে তাঁর মধ্যে প্রতিরোধের অনুভূতি জেগেছে' (প্রভাতকুমার গোস্বামী: ১৩৭৬: ৩৪)। এই প্রতিরোধের মাত্রা সামান্য হলেও তার দৃষ্টান্ত আমরা পাই—

'বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান' বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্'-এর মতো রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচেতনামূলক গান কংগ্রেসের অধিবেশনে গাওয়া হয়। ১৯১১ সালে কলকাতায় ভারতীয় কংগ্রেসের জাতীয় অধিবেশনে গাওয়া হয় বিখ্যাত—

'জনগণমন অধিনায়ক জয় হে' গানটি।

এখানে রবীন্দ্রনাথের কিছু উল্লেখযোগ্য দেশাত্মবোধক গানের তালিকা দেয়া হল।

১. একি অন্ধকার এ ভারত ভূমি
২. একবার তোরা মা বলিয়া ডাক
৩. আমায় বোলো না গাহিতে
৪. কেন চেয়ে আছ গো মা
৫. আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে
৬. ওদের বাধন যতই শক্ত হবে
৭. এবার তোর মরা গাঙ্গে
৮. সার্থক জনম আমার
৯. ও আমার দেশের মাটি
১০. বাধা দিলে বাধবে লড়াই
১১. বুক বেধে তুই দাঁড়া
১২. হবে জয় হবে জয় ॥ প্রভৃতি

সমগ্র উনিশ শতক এবং বিশ শতকের প্রথম দুই দশক পর্যন্ত শুধু যে ভারতবর্ষের সামাজিক-রাজনৈতিক ঘটনা উৎসারিত দেশাত্মবোধক গান রচিত হয়েছে তা নয়। এর বাইরেও অনেক অজ্ঞাত শিল্পী-কবিরা রচনা করেছেন এই ধারার গান। যা এখন হারিয়ে গেছে কালের গর্ভে। 'তাছাড়া গ্রাম বাংলার নিরক্ষর বা অর্ধশিক্ষিত কবিদেরও বহু লোকগীতি অনুধাবন করলে লোকগীতির স্বাদেশীকতার চিত্রটি পুরোপুরি ধরা পড়ে'

*Dhaka University Institutional Repository*

(বুদ্ধদেব রায়; ১৯৯০: ৭০)। আর এই দেশাত্মবোধক গানের বিকশিত ধারার মধ্যেই আর্বিভূত হয়েছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম, আপন প্রতিভা ও স্বতন্ত্র সউজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য নিয়ে।

## গ্রন্থপঞ্জি


১. করুণাময় গোস্বামী

১৯৯৩; বাংলা গানের বিবর্তন; বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

১৯৮৫; বাংলা গান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

২. নারায়ণ চৌধুরী

১৯৯১; বাংলা গানের জগত; ফার্মা কে এলএম প্রা: লি:, কলকাতা

৩. প্রভাতকুমার গোস্বামী (সম্পাদিত)

১৩৭৬: হাজার বছরের বাংলা গান: স্বারসত লাইব্রেরী: কলকাতা।

৪. বুদ্ধদেব রায়

১৯৯০; বাংলা গানের স্বরূপ: ফার্মা কে এল এম প্রা: লি: কলকাতা

৫. শান্তি সিংহ (সম্পাদিত)

১৯৮৮; স্বদেশ আমার: নিউ বেঙ্গল প্রেস; কলকাতা

৬. সীমা বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৮৬; রবীন্দ্রসংগীতে স্বদেশচেতনা: গণমন প্রকাশনী; কলকাতা

৭. হেমাঙ্গ বিশ্বাস

১৩৮৫; লোকসঙ্গীত সমীক্ষা বাংলা ও আসাম; এ মুখাজ্জী এন্ড কোং প্রাঃ লিঃ; কলকাতা।

৮. নজরুল জন্মশতবর্ষ স্মারক গ্রন্থ: ২০০০: পশ্চিমবঙ্গ সাহিত্য আকাডেমি: কলকাতা

Dhaka University Institutional Repository

# নজরুলের স্বদেশচেতনার উৎস ও পটভূমি

যে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিভার মানস গঠন নির্ভর করে তার পারিবারিক পরিমণ্ডল থেকে শুরু করে পারিপার্শ্বিক ও সমাজ বাস্তবতার প্রভাব। মানুষ যেহেতু সামাজিক জীব কাজেই তার মানস গঠন তথা চৈতন্য তৈরির ক্ষেত্রে সমাজের ভূমিকা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ যে শুধু সামাজিক জীব তাই নয়, রাজনৈতিকও। কাজেই শিল্পীর মানসচৈতন্য এবং রাজনৈতিক অনুপ্রেরণাই তাঁকে শিল্প সাধনায় মগ্ন করবে এই-তো স্বাভাবিক। বাংলাদেশে দেশাত্ববোধক সাহিত্য ও সঙ্গীত রচনার মূল উৎস ও পটভূমি ছিল রাজনৈতিক। 'ইংরেজ বশ্যতা ও ইংরেজ শাসনের সংঘর্ষে এসে এই রাজনৈতিক প্রেরণার উৎপত্তি ঘটে। ক্রমে দেশোন্নতি ও সামগ্রিক সামাজিক মুক্তির নানা কামনা এসে এর সঙ্গে যুক্ত হয়। পাশ্চাত্য দেশাত্মবোধক সাহিত্য, সঙ্গীত ও নানা চিন্তাশীল রচনা বাঙালির অন্তরে এই প্রেরণা সঞ্চারে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। .. ইংরেজের সংস্পর্শে এসে শাসক ও শাসিতের সম্পর্কের উপলব্ধির মধ্য দিয়েই বাঙালির মনে স্বদেশপ্রেমের জন্ম হয়'। (করুণাময় গোস্বামী; ১৯৯৩: ২৫৯-২৬০)। আমরা কবি নজরুলের স্বদেশচেতনার উৎস ও পটভূমি আলোচনা করতে গিয়ে বিশ শতকের ভারতবর্ষের তথা বিশ্বের সামাজিক-রাজনৈতিক ঘটনাবলীর দিক একটু দৃষ্টি ফেরাতে চাই। কবি নজরুল জন্মগ্রহণ করেছিলেন উনিশ শতকের শেষ প্রান্তে ১৮৯৯ সালে। ঠিক এর আগের বছরে বাংলাদেশে বৃটিশ লেফটেনান্ট গভর্নর স্যার আলেক জান্ডার ম্যাকেঞ্জি পদত্যাগ করেন এবং তার পরিবর্তে স্যার জন উডবার্ণ নিযুক্ত হন। ১৮৯৯ সালে লর্ড কার্জন ভারতের দায়িত্ব নেন। এই বৎসরই গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ মহীশূর প্রভৃতি স্থানে দুর্ভিক্ষ শুরু হয় এবং ১৯০০ সালে এই দুর্ভিক্ষ মারাত্মক আকার ধারণ করে। প্রায় ১৩ লক্ষ মানুষ এই দুর্ভিক্ষে মারা যায়। এরপর ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের আদেশ জারি করে বৃটিশ শাসকরা পশ্চিমবঙ্গ এবং পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ গঠন করে। নতুন প্রদেশের রাজধানী করেন ঢাকাকে। এর ফলে ভারতে বিশেষ করে বাংলায় ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়। এছাড়াও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন, খেলাফত আন্দোলন স্বরাজ প্রভৃতি সমাজ-রাজনৈতিক আন্দোলন তো রয়েছেই। সেই সঙ্গে ১৯১৪ সালে সংঘটিত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের উন্মত্ততা, সোভিয়েত রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব (১৯১৭) প্রভৃতি ঘটনা প্রবাহের মধ্যদিয়ে অতিবাহিত হয়েছে নজরুলের শৈশব-কৈশোর এবং যৌবন। বাঙালি পল্টনের সৈনিক হিশেবে নজরুল নিজে যোগ দিয়েছিলেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে। ভারতবর্ষ তথা তখন সমগ্র বিশ্ব ছিল নানাবিধ ঘটনা সংঘাতে উন্মাতাল অস্থির। এ ছাড়াও বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে 'নিজ নিজ ধর্মীয় মূল্যবোধের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের পৈশাচিক তৎপরতার বিষবাষ্পে আচ্ছন্ন ছিল দেশ, মানুষ ও মানবতা এবং বিবাদমান সম্প্রদায়ের বিচার

*Dhaka University Institutional Repository*

বিবেকহীন আবেগ ও ঈর্ষায় দিগ্‌ভ্রান্ত হয়েছিল মানুষ। যুগ ও জীবনের এই সন্ধিক্ষণেই নজরুলের আত্মপ্রকাশ ও উদ্দাম অভিযাত্রা' (জামরুল হাসান বেগ; ১৯৯৮; ১১)।

নজরুলের শৈশব কেটেছে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের উত্তাল দিনে। এই আন্দোলন তাঁকে স্পর্শ করেছিল সেই কিশোর বয়সে বৃটিশরা যে এদেশের শত্রু তা তিনি বুঝেছিলেন সেই শিয়াড়শোল রাজার স্কুলে পড়াবস্থায়। তাঁর শৈশবের সহপাঠী শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়-এর লেখায় এর যথার্থ চিত্র পাওয়া যায় —

> বন্দুকটা নজরুলের হাতে দিলে বললাম, মারো এইবার যত পারো।
>
> কেমন করে চালাতে হয় শিখিয়ে দেবার প্রয়োজন হলো না।
>
> কিন্তু পাখী সে কিছুতেই মারবে না। মরুক না মরুক গায়ে তো লাগতো।
>
> অথচ নজরুল সে রাস্তা মাড়ালে না। গোরস্থানের একদিকে সারি সারি কয়েকটি ইট-বাঁধানো বেদীই হলো তার লক্ষ্য। তার ভেতর একটি বেদি হলো বড় লাট, একটি হলো ছোটলাট, একটি হলো ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, আর একটি হল এস-ডি-ও। তার পর একের পর এক চলতে লাগলো তাদের ওপর আক্রমন।
>
> ইট দিয়ে বাধানো চুন-কাম করা বড় বড় বেদী। বেশী দূরেও নয়, মারতে গেলে পাখির মতো উড়েও পালায় না। কাজেই হাতের টিকের বিশেষ প্রয়োজন হলো না। গোল গোল সীসের গুলি এয়ারগানের নলের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে ফটাস্ ফটাস্ করে লাগলো গিয়ে দেশের শত্রু ইংরেজদের গায়।
>
> একটা গুলি লাগে, আর নজরুলের সে কী উল্লাস।
>
> (কেউ ভোলে না কেউ ভোলে; ১৯৯৫; ৪৪-৪৫)

নজরুলের শৈশব দারিদ্র, স্বজনহীন, বেঁচে থাকার তাগিদে আত্মকর্মসংস্থানের চেষ্টায় কাটলেও জানার বা জ্ঞানঅর্জনের আকুলতা ছিল। গ্রামের আর দশটা সাধারণ ছেলের মতো তিনি ছিলেন না। রুটির দোকানে কাজ করেছেন, মক্তবে শিক্ষকতা করেছেন, যোগ দিয়েছেন লেটোর দলে। এভাবে অল্প বয়সেই জীবন-সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে নিজেকে জীবন-অভিজ্ঞতায় যেমন সমৃদ্ধ করেছেন; তেমনি অনুভব করেছেন তাঁর প্রিয় পরাধীন স্বদেশের করুণ অবস্থা। বাঙালি পল্টনে সৈনিক হিশেবে যোগ দেবার পূর্ব পর্যন্ত নজরুল শিয়াড়শোল স্কুলে পড়াশুনা করেন। 'শিয়ারসোল স্কুলে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী যুগান্তর দলের সংশ্লিষ্ট শ্রী নিবারণচন্দ্র ঘটক নজরুলের অন্যতম শিক্ষক ছিলেন। নজরুলকে নিবারণচন্দ্র ঘটক সন্ত্রাসবাদী বিপ্লববাদে প্রভাবিত করেন। পরবর্তী জীবনে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের প্রতি

*Dhaka University Institutional Repository*

নজরুলের যে আকর্ষণ দেখা যায় তার সূত্রপাত ঘটে এখানে। 'কুহেলিকা' উপন্যাসের বিপ্লবী স্কুল শিক্ষক প্রমত্ত চরিত্রের কল্পনায় নিবারণচন্দ্র ঘটকের ছায়া পড়েছে। (রফিকুল ইসলাম: ১৯৭২: ২৭)

নজরুলের শৈশবের কিছু দিন কেটেছে ময়মনসিংহের দরিরামপুরের কাজীর শিমলায়। এখানেও তাঁর মানস গঠন বিশেষ করে মানবিকবোধে অনুপ্রাণীত করেছে বলে কোনো কোনো গবেষক উল্লেখ করেছেন। ধর্ম তার কাছে কখনোই বড় হয়ে দেখা দেয়নি। তিনি মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়েও ধর্মীয় সংকীর্ণতার উর্ধে উঠে ঘোষণা করেছেন 'মানব ধর্ম'। তাঁর এই বোধের পেছনে দরিরামপুরের ভূমিকা থাকা অস্বাভাবিক নয়। "এ স্থানে অল্প কিছু দিন অবস্থান করলেও এ অঞ্চলের ধর্ম নিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক বিষয় ও চরিত্র সম্বলিত গীতিকা এবং সমাজ-সংস্কৃতি নজরুলের মানসলোকে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল। এখানে অবস্থানকালে এ অঞ্চলের কৃষকদের সঙ্গে আড্ডা, তাদের সঙ্গে গান গাওয়া, রাত জেগে স্থানীয় জারী, যাত্রা, কবিগান, পালাগান ও পুঁথির গানের অনুষ্ঠানে দর্শক হিশেবে ঘন্টার পর ঘন্টা, রাতের পর রাত অংশগ্রহণ তাঁর অন্তরে ছড়িয়ে দিয়েছিল অসাম্প্রদায়িক ও ধর্মনিরপেক্ষবোধ ও দর্শনের প্রদীপ্ত আলো" (জামরুল হাসান বেগ; ১৯৯৮: ১৪)।

কখনো কখনো কোনো কোনো অঞ্চলের জলবায়ু, ভূ-প্রকৃতি, পরিবেশ ও জীবনপ্রণালী মানুষের মানসগঠনে প্রেরণার উৎস হিশেবে কাজ করে। সে দিক দিয়ে বর্ধমানের রুক্ষমাটি, ধূসর প্রান্তর, অজয় নদীর বিস্তীর্ণ বালুচর, লোহা কারখানা, কয়লাখনি, ঝড়, বন্যা প্রভৃতি পরিবেষ্টিত 'চুরুলিয়া' নজরুল মানসে যে প্রভাব বিস্তার করেছিল তা বলাই বাহুল্য। তার জন্যই বোধ হয় নজরুল স্থির একরৈখিক ছক বেঁধে জীবন চালনা করেননি। বার বার পালাবদল আর অস্থিরতার মধ্যে কখনো কাব্যে, কখনো সঙ্গীতে, কখনো সাংবাদিকতায়, কখনো রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হয়েছেন। তবে একথা ঠিক যে, তাঁর এ সব কর্মের মধ্যে কখনোই তিনি স্বদেশ ভাবনাকে ত্যাগ করেননি। পারিবারিক স্নেহবঞ্চিত নজরুল তাই সাহিত্যের নান্দনিক পথে না গিয়ে বিদ্রোহের পথে গেলেন, বিপ্লবের স্বপ্নে আপ্লুত হলেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর এ প্রতিবাদের পেছনে যে ঘুনে ধরা, শোষণ-বঞ্চনার সংস্কারাচ্ছন্ন সমাজটাকে পাল্টে দেবার আকাঙ্খা ছিল তা বোঝা যায়— ইব্রাহীম খাঁকে লেখা তাঁর সেই বিখ্যাত পত্রের চরণ থেকে—

> আমি বিদ্রোহ করেছি—বিদ্রোহের গান গেয়েছি অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে— যা মিথ্যা, কলুষিত, পুরাতন-পচা সেই মিথ্যা সনাতনের বিরুদ্ধে, ধর্মের নামে ভণ্ডামী ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। ... এ কুম্ভকর্ণ-মার্কা সমাজকে জাগাতে হলে আঘাত দিয়েই জাগাতে হবে। একদল প্রগতিশীল বিদ্রোহীর উদ্ভব না হলে এর চেতনা আসবে না।

*Dhaka University Institutional Repository*

১৯১৭ হঠাৎ করে বৃটিশ বিরোধী নজরুল বৃটিশদের পক্ষে যুদ্ধ করবার জন্য সেনাবাহিনীতে কেন যোগ দিলেন সে বিষয়টি বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। তখন তিনি দশম শ্রেণীর ছাত্র। একটা বিষয় লক্ষ করার মতো যে নজরুল সৈনিক পদে যোগদানের আগে এবং পরে দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার প্রতি তাঁর দুর্বার আকর্ষণ এবং স্বদেশের মুক্তির চিন্তায় আচ্ছন্ন ছিলেন। কাজেই যার পক্ষেই যুদ্ধে যান— তিনি যে উদ্দেশ্যহীন ভাবে বা খেয়ালের বশে সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়েছেন একথা বলা যাবে না। সে সময়ের সামগ্রিক পরিস্থিতি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনা-প্রবাহ এবং নিজেকে একটি সংগ্রামের (সশস্ত্র?) জন্য প্রস্তুত করতে সৈনিকী শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্য থাকাটা আঠারো বছরের বিদ্রোহী তরুণের জন্য অস্বাভাবিক নয়। এ প্রসঙ্গে জনৈক নজরুল গবেষক লিখেছেন—

'দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে সাথে আন্তর্জাতিক ঘটনা-প্রবাহ ইতিমধ্যে তাঁর মনকে উত্তাল করে তুললো। ফলে তাঁর উপস্থিতি তখন বাংলাদেশের সেই অগ্নিযুগের মধ্যাহ্নকে আরও যেন প্রখর করে তুলেছিল। নজরুল সেই মুহূর্তে সমগ্র শক্তি নিয়ে ঝাপিয়ে পড়েছিলেন স্বাধীনতার প্রার্থিত আন্দোলনের তথা যৌবনের বাঞ্ছিত উন্মত্ততার উন্মুক্ত প্রঙ্গনে। তাঁর কাব্যের প্রকৃত সুরকেও তিনি আবিস্কার করলেন সে দিন জাতীয় মুক্তি আন্দোলন তথা আন্তর্জাতিকতাবাদী ভাব ধারায় অনুপ্রেরণার মধ্যে। কৈশোরে শিয়ারশোল রাজ হাইস্কুলের শিক্ষক বিপ্লবী নিবারণ ঘটকের অনুপ্রেরণা তিনি বিস্মৃত হননি। এই নিবারণ ঘটকের উৎসাহেই তিনি সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধে অস্ত্র ব্যবহার যথাযথ ভাবে আয়ত্ব করে আসা। যদিও তাতে কৈশোরের উচ্ছ্বাসই প্রধানত দায়ী ছিল' (বাঁধন সেনগুপ্ত: ১৯৭৬: ৫৭-৫৮)।

ভারতবর্ষের মানুষের ধর্মভীরুতা এবং নিজ নিজ ধর্মের সপক্ষে অবস্থান নিয়ে অন্য ধর্মাবলম্বীদের হেয় ভাবা নজরুলকে ব্যথিত করেছিল। পরাধীন, দূর্বল, প্রতিবাদহীন ভীরু মানুষের আবার ধর্ম কী? এই প্রশ্ন তিনি উথাপন করে ভারতবাসীকে জাগাতে চেয়েছেন। আর এর পেছনে কাজ করেছেন তাঁর দেখা গোড়া সংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু ধর্ম এবং মুসলিম মোল্লাতন্ত্রের বিষবাষ্প। সে সময়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় পরাজিত মানবতার প্রতি নজরুল ধর্ম নিয়ে আত্ম-জিজ্ঞাসায় মুখর হয়েছেন—

> আমার আবার ধর্ম কি? যার ঘরে বসে কথা কইবার অধিকার নেই দুপুর রাতে দুঃস্বপ্নে যার ঘুম ভেঙ্গে যায়। অত্যাচারকে চোখ রাঙ্গাবার যার শক্তি নেই, তার আবার ধর্ম কি? যাকে নিজের ঘরে পরে এসে অবহেলায় পশুর মতো মেরে ফেলতে পারে, যার ভাই-বোন-বাপ-মাকে মেরে ফেললেও বাক্যস্ফুট করবার আশা নাই তার আবার ধর্ম কি? দু-বেলা দুটি খাবার

*Dhaka University Institutional Repository*

> জন্যই যার বাঁচা, একটু আরাম করে কাল কাটিয়ে দেবার জন্যই যার থাকা, তার আবার ধর্ম কি?
>
> (আমার ধর্ম)

পরাধীন দেশের গ্লানি-যাতনা, ভাই-এ ভাই-এ ভেদ, শোষিত দারিদ্র মানুষের ক্রন্দন নজরুলকে ভেতর থেকে জাগিয়ে তুলেছিল। অনুপ্রাণীত করেছিল মানবিক ও স্বাদেশিক দায়িত্ববোধে। 'নজরুল মানস-গঠনের প্রাথমিক পর্যায় সমূহ এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। একদিকে অসহযোগ আন্দোলন ও খেলাফত আন্দোলন কেন্দ্রিক হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির পরিবেশ, অন্যদিকে রুশ-বিপ্লব প্রভাবিত সাম্যবাদী চিন্তাচেতনা নজরুল মানসে একক বিশিষ্ট মানবতাবাদের জন্ম দিয়েছিল, ধ্বনিত হয়েছিল তাঁর কণ্ঠে যুগবাণী। তাঁর সেই বাণীতে, তাঁর কবিতায় গানে উন্মাতাল হয়ে উঠেছিল সারা দেশের তরুণ চিত্ত' (মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান; ওয়াকিল আহমেদ (সম্পাদিত): ২০০০: ১০৯)

হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি চেতনায় নজরুল যে কী আন্তরিক ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁরই লেখা অসাধারণ এক গানে—

> মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম/ হিন্দু-মুসলমান।
> মুসলিম তার নয়ন-মণি/ হিন্দু তাহার প্রাণ ॥

নজরুল তাঁর অসংখ্য লেখায়, কবিতায় গানে তরুণের জয়গান করেছেন। পুরাতন, জীর্ণকে ফেলে নতুন দিনের আহবানে তরুণদেরকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সত্য, ন্যায় ও দেশের পক্ষে আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি নিজের তরুণ প্রাণে যে সঙ্গীতের সুর শুনেছেন তাই যেন শুনিয়ে অন্যদেরকে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন। নিজের বুকের গভীরে যে বেদনা, যে অপূর্ণতা তা যেন নতুন প্রত্যাশার আলোয় লুকিয়ে রেখে সাহসী অনাগত তরুণের পথ চেয়ে বসে আছেন। তাইতো পুরবাসীর কাছে তিনি ভিক্ষা চেয়েছেন সেই সোনার ছেলে, সেই তরুণ—

> ওরে তরুণের দল! একবার বুকে হাত দিয়ে বল দেখি একবারও কি এ নাগপাশ ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে হয়নি? একবারও কি এই জগদ্দল পাথর ঠেলে ফেলতে ইচ্ছা হয়নি? ওরে ওঠ, ওরে তোরা ওঠ, দূর করে দে জড়তা, ছিড়ে ফেলে দে বন্ধন। হৃদয় থেকে কোমলতা দূর করে দে। শয়তানের হিংসা নিয়ে শত্রুর পানে একবার ছুটে চল। (ভিক্ষা দাও)

নজরুল জানতেন তাঁর একার পক্ষে এই বিদ্রোহ-সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে তেমন কিছু করা সম্ভব নয়। তাই অন্যদের উৎসাহিত করে জাগিয়ে তুলতে তিনি সাহিত্য ও সঙ্গীতের সাধনা করেছেন। তাঁর নিজের ভেতরের ক্ষমতা সম্পর্কে তিনি জানতেন বলেই (দ্র. জন-সাহিত্য) উচ্চারণ করেছেন—

Dhaka University Institutional Repository

ঘা দিয়ে দ্বারা খুলবো না গো
গান গেয়ে দ্বার খুলবো।

এই দ্বার তথা শৃঙ্খল খোলার অভিপ্রায় নিয়ে সঙ্গীত রচনা করেছেন বলেই নজরুল সঙ্গীতের এক বিরাট অংশ জুড়ে ছড়িয়ে আছে স্বদেশচেতনার পরিচয়। 'কবি নজরুল তাঁর পরাধীন স্বদেশবাসীকে শিকল ছেড়ার গান শুনিয়েছেন, স্বদেশের নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের সামগ্রিক জাগরণ ও চিত্ত উত্থান কামনা করেছেন। এবং সব রকম কুসংস্কারের জগদ্দল পাথর গুড়িয়ে দিয়ে সেখানে মুক্ত বুদ্ধির প্রতিষ্ঠা চেয়েছেন'। কিন্তু তাঁর এই বাণী একটি বিশেষ সময়ে ও সংকট সন্ধিক্ষণে বিশেষ বিশেষ সমাজের মানুষের জন্য ধ্বনিত হলেও তা যেহেতু সত্য ও সুন্দরের পথ ধরে এসেছে, সে কারণে হয়ে উঠেছে বিশ্ব-মানবিক ও সার্বজনীন' (মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ; ১৯৮২; ৭৯)।

আর এ জন্যই তিনি ভারতবাসীকে আহ্বান জানিয়েছেন তাঁর গানে সত্য ন্যায় ও স্বাধীনতার পথে। তিনি অনুভব করেছিলেন সম্মিলিত প্রয়াস ছাড়া এ আন্দোলনের ফসল ঘরে উঠতে পারে না।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মারাত্মক বিশ্বব্যাপী ধ্বকল এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে সর্বহারার বিপ্লব ভারতবাসীকে আলোড়িত করেছিল প্রচণ্ডভাবে। এর ফলে ভারতসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মুক্তির আন্দোলনে নতুন চেতনার জোয়ার বয়ে যায়। বুদ্ধিজীবী-বুর্জোয়া নেতৃত্বের সঙ্গে এবার যুক্ত হয় শ্রমিক-কৃষক শ্রেণী। তারা উজ্জীবিত হল বিপ্লব ও সাম্যবাদে। তখন শ্রমিক কৃষকের নবজাগরণের, ঐক্যের, আন্দোলনের, বিদ্রোহের সাহিত্য ও সঙ্গীত রচনায় অনুপ্রাণীত হন নজরুল। এর সঙ্গে অবশ্য আরও একটি বিষয় উল্লেখ করা আবশ্যক— আর তা হচ্ছে কমরেড মোজফফর আহমদের নাম। শ্রমিক শ্রেণীর এই শ্রদ্ধেয় নেতার সাহচর্য ও শিক্ষা যে নজরুলের চেতনা ও মতাদর্শ গঠনে সহায়তা করেছিল তা বলাই বাহুল্য। "নজরুলের স্বদেশপ্রেম ও সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ সম্পর্কে মোহহীনতা তার শ্রেণীচেতনার সাক্ষ্য বহন করে। তাঁর পূর্বসুরীদের মধ্যে অনেকেরই ইংরেজ সম্পর্কে স্পষ্টতই দুর্বলতা ছিল, ঈশ্বর গুপ্ত, রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে তো ইংরেজ-প্রশস্তি বহু ক্ষেত্রেই লক্ষ করা যায়। আনন্দমঠের প্রথম মুদ্রণের বিজ্ঞাপনে বঙ্কিমচন্দ্র তো প্রকাশ্যেই বললেন— 'সমাজবিপ্লব অনেক সময় আত্মপীড়ন মাত্র, বিদ্রোহী বা আত্মঘাতি ইংরেজরা বাংলাদেশকে অরাজকতা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন'। এরা কেউ-ই স্বদেশপ্রেমের রোমান্টিক মনোভাবে উর্ধ্বে উঠতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য অনেকখানি সোচ্চার.... কিন্তু নজরুলের মতো সর্বাত্মক বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পারেননি" (অনুনয় চট্টোপাধ্যায়; কাজী নজরুল ইসলাম জন্মশতবর্ষ স্মারক গ্রন্থ; ২০০০; ৫৮৮-৮৯)।

ব্যক্তি ও শিল্পী জীবনে নজরুল বার বার পালা বদল ঘটালেও তার সব কাজেই স্বদেশানুরূপের পরিচয় বিধৃত হয়েছে। তিনি যতই মানুষের কাছে গেছেন গ্রাম থেকে গ্রামে

*Dhaka University Institutional Repository*

ঘুরে বেড়িয়েছেন ততই দেশের প্রতি তাঁর ভালবাসা প্রগাঢ় হয়েছে। আর এই ভালবাসাই তাঁকে অনুপ্রাণীত করেছে— বিদ্রোহী কবিতা লিখতে, স্বদেশী গান করতে উজ্জীবনের গান করতে। আর এ কারণেই বাংলা স্বদেশীসংগীতে নজরুলের অবদানের সঙ্গে অন্য কারও তুলনা চলে না। নজরুল একক, অনন্য এবং অসাধারণ। আমরা পরের একটি অধ্যায়ে পৃথক ভাবে নজরুলের এই স্বদেশচেতনামূলক গানের বিস্তারিত আলোচনা করবো।

## গ্রন্থপঞ্জি

১. ওয়াকিল আহমেদ (সম্পাদনা)
২০০০, কাজী নজরুল ইসলাম : জন্ম শতবর্ষ; বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি; ঢাকা

২. করুণাময় গোস্বামী
১৯৯৩: বাংলা গানের বিবর্তন; বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৩. জামরুল হাসান বেগ
১৯৯৮; নজরুল ইসলাম ও অন্যান্যরা : বাংলা একাডেমী; ঢাকা

৪. বাঁধন সেনগুপ্ত
১৯৭৬; নজরুল কাব্যগীতি : বৈচিত্র্য ও মূল্যায়ন; নবজাতক প্রকাশনী; কলকাতা

৫. মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ
১৯৮১; সাহিত্যের রূপকার : ইসলামিক ফাউন্ডেশন; ঢাকা।

৬. রফিকুল ইসলাম
১৯৭২; নজরুল জীবনী; বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ঢাকা

৭. শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
১৯৯৫; কেউ ভোলে না কেউ ভোলে; নিউ এজ পাবলিশার্স; কলকাতা

*Dhaka University Institutional Repository*

# নজরুলের সাহিত্যে স্বদেশচেতনা

বাংলা সাহিত্যে নজরুলের আর্বিভাব ধূমকেতুর মতো। ১৯২২ সালে মাত্র ২৩ বৎসর বয়সে নজরুল তাঁর অগ্নি-বীণা গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। তখনই তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে বিদ্রোহী কবি হিশেবে। নজরুল প্রধানত কবি হলেও গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ প্রভৃতিও রচনা করেছেন। কবিতার পাশাপাশি সেখানেও তিনি স্বঅহংকারে তাঁর স্বদেশচেতনার স্বাক্ষর রেখেছেন। মূলত বিদেশী শাসন, সামাজিক অবিচার, ধর্মীয় গোড়ামীর বিরুদ্ধে এবং স্বদেশের বঞ্চিত-লাঞ্ছিত মানুষের স্বপক্ষে তিনি তাঁর লেখনিকে ধারণ করেছিলেন। তাঁর এই স্বদেশ ভাবনা কখনো কখনো শিল্পের নান্দনিক রীতিকে ক্ষুন্ন করলেও বক্তব্য বা বিষয়ের সঙ্গে সাহিত্যিক নজরুল আপোষ করেননি। 'কাজী নজরুল ইসলাম সেই সব কবি-শিল্পী-সাহিত্যিকদের একজন যারা ব্যক্তিগত ও দেশচৈতন্যকে একই আধারে সমন্বিত করেছেন, ব্যক্তিমনের আশা-আকাঙ্খা-আর্তি-আকুলতা ও নানামুখী চেতনাকে ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে ব্যাপক-অর্থে দেশচৈতন্যকেই রূপায়িত করেছেন' (মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ: ১৯৮১: ৩৭)। সাহিত্যকে নজরুল বিনোদনের উপকরণ বা সৌন্দর্যের মাধ্যম হিশেবেই দেখেননি; এর মাধ্যমে সামাজিক দায়িত্ব পালন এবং গণসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে দেশপ্রেমের স্বাক্ষরও তিনি রেখেছেন। আমরা এ অভিসন্দর্ভে নজরুল সঙ্গীতে স্বদেশচেতনার স্বরূপ আলোচনা করতে গিয়ে নজরুলের সাহিত্যে স্বদেশপ্রেমের যে পরিচয় পাওয়া যায় সে বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপনে আগ্রহী। প্রথমেই আমরা নজরুলের কাব্যে স্বদেশপ্রেমের প্রসঙ্গগুলো তুলে ধরতে চাই।

নজরুল রচিত কাব্যগুলোকে গবেষক আবদুল মান্নান সৈয়দ (নজরুল ইসলাম কবি ও কবিতা: ১৯৭৭: ৬৭) দু-ভাগে ভাগ করেছেন। একটি তাঁর সমাজ-সত্তায় সমর্পিত কবিতা অন্যগুলো ব্যক্তিগত নিঃসরণের কবিতা। মূলত প্রথম শ্রেণীভুক্ত কাব্য গুলোতেই কবি নজরুলের দেশপ্রেমের পরিচয় ফুটে উঠেছে সুতীব্রভাবে। আর এই ধারার প্রধান প্রধান কাব্য গুলো হচ্ছে— অগ্নি-বীণা (১৯২২), বিষের বাঁশী (১৯২৪), ভাঙ্গার গান (১৯২৪, সাম্যবাদী (১৯২৫), সর্বহারা (১৯২৬), ফণিমনসা (১৯২৭), জিঞ্জীর (১৯২৮), সন্ধ্যা (১৯২৯) এবং প্রলয় শিখা (১৯৩০)। এ কাব্যগুলোর নামকরণের মধ্যেই রয়েছে স্বদেশচেতনার বীজ। নজরুল তাঁর সাহিত্য জীবনের প্রথম দশ পনেরো বছরের মধ্যেই রচনা করেছেন এই কাব্যগুলো। অগ্নি-বীণার তৃতীয় কবিতা 'রক্তাম্বরধারিণী মা'তে তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করে শত্রুর রক্তে রঞ্জিত হবার আহ্বান জানিয়েছেন —

আজ হতে মাগো অসহায় সম
ক্ষীণ ক্রন্দন সম্বর।

*Dhaka University Institutional Repository*

মেখলা ছিড়িয়া চাবুক কর মা,
সে চাবুক কর নভ-তড়িৎ
জালিমের বুক বেয়ে খুন ঝরে
লালে লাল হোক শ্বেত হরিৎ।

এর পূর্বেই তিনি 'বিদ্রোহী' কবিতায় ঘোষণা করেছেন—

আমি সেই দিন হব শান্ত,
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে-বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না—

'আগমনী' কবিতায় তিনি ঘোষণা করেছেন 'বন্দে-মাতরম'। এছাড়াও মুসলিম শক্তির প্রতীকে 'কামাল পাশা' এবং মোহাররম কবিতায় দুশমনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

বিষের বাঁশী'র 'কৈফিয়ত' নামক মুখবন্ধে কবি তাঁর এ কাব্য রচনার প্রেরণা সম্পর্কে যা বলেছেন কবিতাগুলো আলোচনা না করেও তা তুলে দিলেই যথেষ্ট-

> 'এ বিষের বাশীর বিষ যুগিয়েছেন আমার নিপীড়িতা দেশ মাতা, আর আমার ওপর বিধাতার সকল রকম আঘাতের অত্যাচার' (নজরুল রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, বা. এ, পৃ-৮৯)

এই কাব্যের 'সেবক' কবিতায় কবি দেশের মুক্তির লক্ষ্যে জীবন উৎসর্গ করতে যারা প্রস্তুত তাদের আহ্বান জানিয়েছেন—

দেশের পায়ে প্রাণ দিতে আজ ডাক পড়েছে তাদের
সত্য মুক্তি স্বাধীন জীবন লক্ষ শুধু যাদের।

এছাড়াও তূর্য নিনাদ, বোধন, উদ্বোধন, অভয় মন্ত্র, আত্মশক্তি, মরণ-বরণ প্রভৃতি কবিতায় স্বদেশের জন্য বাঙালিকে উদ্দীপনার মন্ত্র শুনিয়েছেন। 'শিকল-পরার গানে' কবি লিখেছেন—

মোরা আপনি মরে মরার দেশে আন্‌ব বরাভয়,
মোরা ফাঁসি পরে আন্‌ব হাসি মৃত্যু-জয়ের ফল।

'চরকার গানে' কবি 'স্বরাজ'কে সমর্থন করে স্বাধীন ভারতের স্বপ্নে উজ্জীবিত হয়েছেন। এছাড়াও অন্যান্য কবিতায় নজরুল স্বদেশানুরাগের অকৃত্রিম অনুভূতিই ফুটিয়ে তুলেছেন।

'ভাঙ্গার গান' কাব্যে দেশ-প্রেমমূলক সঙ্গীতের প্রাধান্যই বেশি। সে জন্য গানের আলোচনায় না গিয়ে (এ বিষয়ে পৃথক ও বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে) শুধু 'দুঃশাসনের রক্তপান' কবিতাটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। বিদেশী শাসকদের রক্তপান করে কবি এখানে তার প্রতিশোধ স্পীহাকে ফুটিয়ে তুলেছেন যেন—

Dhaka University Institutional Repository

বলরে বন্য হিংস্রবীর,
দুঃশাসনের চাই রুধির।
চাই রুধির রক্ত চাই,
ঘোষো দিকে দিকে এই কথাই
দুঃশাসনের রক্ত চাই।

সে সময়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠী ভারতবাসীকে নিক্ষেপ করেছিল অপরিসীম দুঃখ-লাঞ্ছনার মধ্যে। পাশাপাশি এদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল দেশীয় দোসররা, যারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই শোষণকে স্থায়ী করতে সচেষ্ঠ হয়েছিল। তাই নজরুল তাঁর কাব্যসাধনার শুরুতেই ভারতবর্ষকে এই শোষণের নাগপাশ থেকে মুক্ত করে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছেন। তাঁর বিভিন্ন কবিতায় আমরা তারই প্রতিচ্ছবি পাই—

যেথায় মিথ্যা ভণ্ডামী ভাই,
করবো সেথায় বিদ্রোহ !
ধামাধরা! জামাধরা
মরণ-ভীতু চুপ রহো !
আমরা জানি সোজা কথা —
পূর্ণ স্বাধীন করবো দেশ। (বিদ্রোহের-বাণী)

কিংবা

রাজ্যে যাদের সূর্য অস্ত যায় না কখনো, শুনিস হায়,
মেরে মেরে যারা ভাবিছে অমর, মরিবে না কভু মৃত্যু-ঘায়
তাদের সন্ধ্যা ঐ ঘনায়।
চেয়ে দেখ ঐ ধূম্র-চূড়
অসন্তোষের মেঘ-গরুড়
সূর্য তাদের গ্রাসিল প্রায়।

(ফনিমনসা : যা শত্রু পরে পরে)

সাম্যবাদী এবং সর্বহারা কাব্যে নজরুলের স্বদেশচেতনা সরাসরি তীব্র ভাবে প্রকাশ না পেলেও অবিচার-শোষণ-অত্যাচারের বিরুদ্ধে মানুষকে প্রতিরোধের আহ্বান জানিয়েছেন। এদেশের কোটি কোটি শোষিত-নিপীড়িত মানুষের জন্য তাঁর এই আর্তি ও আকুলতা দেশপ্রেমের বহিপ্রকাশ ছাড়া আর কি-বা হতে পারে। নজরুল তাঁর কাব্যে মানবতার যে জয়গান করেছেন— সে মানুষ এই পরাধীন ভারতের-ই কৃষক-শ্রমিক-জনতা।

'নজরুল স্বদেশ ও স্বজাতির মনোবেদনাকে কবিতার ভাষা ও আঙ্গিকে বিচিত্র রূপে বিধিত করেছেন। স্বদেশ প্রেম, জাতীয় চেতনা ও জাগরণী-

*Dhaka University Institutional Repository*

> প্রেরণা সৃষ্টির সামাজিক ও মানবিক দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি তাঁর কবিতা, গান ও অন্যান্য রচনাকে ব্যবহার করেছেন হাতিয়ার রূপে'।
>
> (মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ; ১৯৮১; ৮৭)

কাব্যের মতোই নজরুল তাঁর প্রবন্ধে সাম্য-মানবতা তথা স্বদেশানুরাগের সুর ধ্বনিত করেছেন। সংখ্যা বিচারে খুব বেশি না হলেও গুরুত্বের দিক থেকে এগুলো অবহেলার নয়। নজরুল মূলত ধূমকেতু, নবযুগ, গণবাণী প্রভৃতি পত্রিকার প্রয়োজনে বা তাগিদে এ প্রবন্ধগুলো রচনা করেন। তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থগুলো হচ্ছে যুগবাণী (১৯২২), রাজবন্দীর জবানবন্দী (১৯২৩), দুর্দিনের যাত্রী (১৯২৬), রুদ্র মঙ্গল (১৯২৬) এবং ধূমকেতু। প্রবন্ধগুলোতে সাংবাদিক নজরুলের ছায়াধরা পড়লেও এর মধ্যদিয়ে এ দেশ এবং দেশের মানুষের প্রতি তাঁর মমত্ববোধের পরিচয় রয়েছে। রাজনীতি, সমাজ এবং সাহিত্য নিয়ে রচিত প্রবন্ধের পাশাপাশি তিনি 'চানাচুর' জাতীয় লঘুচালের কিছু ব্যক্তিগত লেখাও লিখেছেন। তরুণ সমাজ এবং ভারতবাসীকে জাগরণের বাণী শুনিয়েছেন তাঁর যুগবাণীর প্রবন্ধে। প্রথম প্রবন্ধ 'নবযুগ'-এ লিখেছেন —

> আজ মহাবিশ্বে মহাজাগরণ, আজ মহামাতার মহা আনন্দের দিন, আজ মহামানবতার মহাযুগের মহাউদ্বোধন। ..... ঐ শোনো, শৃঙ্খলিত নিপীড়িত বন্দীদের শৃঙ্খলের ঝনৎকার। ঐ শোনো, মুক্তি পাগল মৃত্যুঞ্জয় ঈশানের মুক্তি বিষাণ। ঐ শোনো, মহামাতা জগদ্ধাত্রীর শুভ শঙ্খ ! ঐ শোনো, ইসরাফিলের শিঙ্গায় নব সৃষ্টির উল্লাস-ঘন রোল'।

বৃটিশ শাসিত ভারতবর্ষের শোষিত মানুষের সংগ্রামের সপক্ষে স্বরাজের ডাককে তিনি সমর্থন করে 'মুশকিল' প্রবন্ধে লিখেছেন —

'মূক মৌণমুখে মুক্তির কলরব জাগিয়ে তুলতে হবে। সকল প্রকার মিথ্যা অত্যাচারের বিরুদ্ধে যাতে জনসাধারণ অকুণ্ঠচিত্তে পরিপূর্ণ বিদ্রোহ করতে পারে তার ব্যবস্থা চাই। আর তা না হলে শুধু ভদ্রলোকের জটলাতে স্বরাজের পাকা বুনিয়াদের প্রতিষ্ঠা হবে না-এতে সন্দেহ নেই'। দেশ জনতার স্বপক্ষে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনকেও তিনি সমর্থন জানিয়ে প্রবন্ধে লিখেছেন— 'দেশের যতো লাঞ্ছিত, তাহাদের ব্যথা বুকে লইয়া মহাত্মা ভারতের শহরে শহরে ঘুরিতে লাগিলেন। আর বলিতে লাগিলেন 'কে আছ লাঞ্ছিত পতিত। ওঠো, জাগো ! মুক্তি তোমার দুয়ারে'। আমার ধর্ম প্রবন্ধেও তিনি এই বক্তব্যেরই প্রতিধ্বনি তুলে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকাকে তাঁর ধর্ম বা প্রত্যাশা হিশেবে উল্লেখ করেছেন। তাঁর 'যুগবাণী' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে প্রকাশকের নিবেদনে বলা হয়েছে— 'অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলনের যুগে প্রতিক্রিয়াশীল বৈদেশিক গভর্ণমেন্টের অত্যাচার ও অনাচারের বিরুদ্ধে এবং সমাজের মজ্জাগত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কবি নজরুল ইসলাম অধুনালুপ্ত

*Dhaka University Institutional Repository*

দৈনিক নবযুগের সম্পাদকীয় স্তম্ভে জ্বালাময়ী ও প্রাণস্পর্শী ভাষায় যে-সব প্রবন্ধ লিখিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন, বন্ধু-বান্ধবদের অনুরোধক্রমে তাহার কতকগুলি 'যুগবাণী' নামদিয়া প্রকাশ করেন'।

'ধুমকেতুর পথ' প্রবন্ধে নজরুল স্বাধীনতার সপক্ষে তাঁর তীব্র অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন। তিনি ভারতকে স্বাধীন দেখতে চান পরিপূর্ণ ভাবে—

> সর্বপ্রথম ধূমকেতু ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চায়। স্বারাজ-টরাজ বুঝিনা। কেননা ও কথাটার মানে এক এক মহারথী এক এক রকম করে থাকেন। ভারতের এক পরমাণু অংশও বিদেশীর অধীন থাকবে না। ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ দায়িত্ব, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা-রক্ষা, শাসন ভার, সমস্ত থাকবে ভারতীয়ের হাতে। তাতে কোন বিদেশীর মোড়লী করবার অধিকারটুকু পর্যন্ত থাকবে না।

নজরুলের মতো করে এতো স্পষ্ট এবং সাহসী উচ্চারণ সে কালে আর কোনো লেখক করেছেন বলে জানা নেই। এই সাহসী উচ্চারণের জন্য তাঁকে কারাবন্দীও হতে হয়েছে। তবু তিনি দমেননি। দেশ-প্রেমের চেতনায় সচল রেখেছেন তাঁর লেখনি।

নজরুলের অভিভাষণের মধ্যেও রয়েছে স্বদেশচেতনার নিবিড় পরিচয়। এমনকি সাহিত্য বিষয়ক যে প্রবন্ধ রচনা করেছেন: সেখানেও তিনি বর্তমান বিশ্বসাহিত্যের যে দুটি ধারার (স্বপ্নলোকের গান এবং ধূলিমলিন পৃথিবীর শিকড় ধরা সাহিত্য) কথা বলেছেন এর মধ্যে তিনি ধূলির পৃথিবীর মানবতাবাদী লেখকদের পক্ষে বলে ঘোষণা দিয়েছেন ।

এবার নজরুলের কথাসাহিত্যের দিকে দৃষ্টি দেয়া যেতে পারে। সব মিলিয়ে ৩টি উপন্যাস এবং ৩টি গল্পগ্রন্থ লিখেছেন। কিছু নাটক এবং শিশুতোষ লেখাও আমরা পাই। বাঁধন-হারা (১৯২৭), মৃত্যুক্ষুধা (১৯৩০) এবং কুহেলিকা (১৯৩১) উপন্যাস। গল্পগ্রন্থ হচ্ছে— ব্যাথার দান (১৯২২), রিক্তের বেদন (১৯২৪) এবং শিউলীমালা (১৯৩১)।

নজরুলের ছোট গল্পগুলো মূলত প্রেম তথা নর-নারীর মানবিক সম্পর্কের বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে। সেখানে দু-একটি চরিত্রের মধ্যে দেশপ্রেমের মনভাব থাকলেও তা গৌণ। কিন্তু নজরুলের উপন্যাসগুলোতে স্বদেশ ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায় বেশ তীব্র ভাবেই। প্রথম উপন্যাস 'বাঁধন-হারা' আঙ্গিক বিচারে 'পত্রোপন্যাস'। এর রচনাকাল 'বিদ্রোহী' কবিতা রচনার কেবলই পূর্বে। 'বস্তুত নজরুল-কাব্যে কবির যে জীবনদর্শন আমরা খুঁজে বের করার চেষ্টাকরি তার কিছু সন্ধান তিনি এই 'বাঁধন-হারা'য় রেখে গেছেন। তাঁর ব্যক্তিগত চিন্তা-ভাবনা তো বটেই এমন-কি সমাজ, ব্যক্তি-ধর্ম এবং রাজনৈতিক চিন্তার স্পষ্ট ছাপও এতে প্রতিফলিত। কিসের জন্য তাঁর বিদ্রোহ, কেন বিদ্রোহী তিনি, তিনি আস্তিক অথবা নাস্তিক এই সবের বিশদ ব্যাখ্যা 'বাঁধন-হারা'য় আছে বলে আমার বিশ্বাস' (শাহাবুদ্দিন

*Dhaka University Institutional Repository*

আহমদ: ১৯৭৬: ২০২)। বাঁধন-হারার নায়ক নূরুল হুদার মধ্যে যে বিদ্রোহী ও প্রতিবাদী চেতনা আছে— তা যেন নজরুলেরই চেতনা। তবে এই চেতনা ব্যক্তি গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ বলে ততটা আলোচিত হয়নি। তবু নজরুল সৃষ্টি মানসে স্বদেশচেতনা জাগ্রহ—

> তরুণ যুবা, তোমরা, সবুজ বুকের তাজার খুন দিয়ে বীরের মতো স্বদেশের কল্যাণ সাধন করতে দুর্নাম দুর করতে ছুটে গিয়েছ তা হেরেমের পুরস্ত্রী হলেও আমাদের মতো অনেক শিক্ষিতা ভগিনীই বোঝেন। তাই অনেক অপরিচিতার অশ্রু তোমাদের জন্য ঝরছে। (বাঁধন-হারা)

'মৃত্যুক্ষুধা' মূলত সমাজের নিম্নবৃত্ত শ্রেণীর মানুষের সুঃখ-দুঃখ আর জীবন-সংগ্রামের আখ্যান। এখানে সামাজিক সমস্যা এবং তার নেপথ্যে শোষক শ্রেণীর অভাবী মানুষকে ধর্মান্তর করানোর বিষয় এসেছে চমৎকার ভাবে। মূলত সাম্রাজ্যবাদী বিদেশী শাসক এবং তাদের কূটকৌশলের কাছে পরাজিত এদেশের অশিক্ষিত-অনাহারী মানুষের জীবনালেখ্য এ উপন্যাসটি। এখানে আমরা আনসারের মতো সাম্যবাদী চরিত্রের সমাবেশও লক্ষ করি। তার মুখে শুনি—

> তার মনে, কোনো এক শুভ প্রভাতে মাথাটা দেহের সঙ্গে নন-কো-অপারেশন করে বসবে— এই ত? তা ভাই, যে দেশের মাথাগুলো নোয়াতে নোয়াতে একে বারে পায়ের কাছে এসে ঠেকেছে, সে দেশের দু-একটি, মাথা যদি খাড়া হয়ে থেকে তার ঔদ্ধত্যের শাস্তি স্বরূপ খাড়ার ঘা-ই লাভ করে তা'হলে হেঁট মাথাগুলোর অনেকখানি লজ্জা কমে যাবে মনে করি'। (মৃত্যুক্ষুধা)

আনসার অন্যত্র বলেছে— 'আমি শুধু ভারতের জলবায়ু মাটি পর্বত অরণ্যকেই ভালবাসি নাই। আমার ভারতবর্ষ-ভারতের এই মূক-দরিদ্র নিরন্ন পরপদ দলিত তেত্রিশ কোটি মানুষের ভারতবর্ষ'।

এভাবেই তাঁর উপন্যাসের আখ্যান, চরিত্র এবং ঘটনার মধ্যে আমরা স্বদেশভাবনার পরিচয় পাই।

তাঁর শেষ উপন্যাস 'কুহেলিকা' রোমান্টিক ভাববলয় অতিক্রম করে সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং চেতনার ফসল বলা যায়। মূলত অসহযোগ আন্দোলন পরবর্তী সন্ত্রাসবাদ-ই এর মূল বিষয়। উপন্যাসের নায়ক জাহাঙ্গীর কুমিল্লার এক জমিদারের সন্তান হয়েও সন্ত্রাসবাদী। 'সেকালের উদারচেতা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পাশাপাশি সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনও তখন আত্মসমালোচনায় উদগ্রীব, এই সব আন্দোলনে মুসলিম কর্মীদের অংশগ্রহণের যে প্রয়োজন ছিল, সুস্থ রাজনৈতিক চেতনায় প্রবুদ্ধ নজরুল তা স্বাভাবিক ভাবেই স্বীকার করে নেন। 'কুহেলিকা'র কাহিনীতে এর স্পষ্ট প্রমাণ আছে জাহাঙ্গীরের

Dhaka University Institutional Repository

বিপ্লববাদে দীক্ষা গ্রহণে। বিতর্কিত সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন সম্পর্কেও তাঁর মত স্পষ্ট' (আতোয়ার রহমান: ১৯৯৪: ৩৫)। উপন্যাসে চরিত্রসমূহে সন্ত্রাসবাদী আচরণ বিষয়বস্তুগত কারণে আভাসিত হলেও, এর নেপথ্যে কখনো কখনো স্বদেশানুরাগের পরিচয় ফুটে উঠেছে। যেমন সন্ত্রাসবাদী দলের নেতা প্রমত্ত বলেন —

> ইরান তুরানের দিকে যে ওরা চেয়ে আছে, তাতে ওদের খুব বেশি দোষ দেওয়াও চলে না। দুর্বল মাত্রই পরমুখাপেক্ষী। .... যে মাটী ওদের ফুলে ফলে শস্যে জলে জননীর অধিক স্নেহে লালন পালন করেছে সেই মাটির ঋণের কথা তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে হবে' (কুহেলিকা)

এভাবে নজরুল এদেশের মাটি, মানুষ এবং মানুষের ভালবাসার ঋণের কথা স্মরণ রেখে সাহিত্যসাধনা করেছেন। সাহিত্যকে নান্দনিক গুরুত্ব থেকে টেনে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন স্বদেশিক দায়িত্ববোধের কাঠগড়ায়। আর তাই 'স্বদেশপ্রেমের রূপকার হিশেবে নজরুল সমগ্র দেশবাসীর আশা-আকাঙ্খা, কামনা-বাসনা ও মুক্তি স্পৃহাকে তার গান ও কবিতায় বাঙ্ময় করে তুলেছেন: নিছক নিসর্গ-প্রীতির মধ্যে দেশপ্রেমের আবেগকে সীমাবদ্ধ রাখেননি বলে তাঁর পক্ষে সমগ্র জাতিকে নিবিড় আত্মীয়তা বোধে চিনে নেওয়া সম্ভব হয়েছিল' (মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ: ১৯৮১: ৮৭)। সে কালে অন্যদের সঙ্গে নজরুলের স্বদেশচেতনার পার্থক্য ছিল। অন্যদের রচনায় দেশ ভক্তি ছিল, পরাধীনতার যাতনা ছিল, কিন্তু বিদ্রোহ ও শৃঙ্খল ভাঙ্গার উদ্দমতা ছিল না; যা নজরুলের সাহিত্যে ছড়িয়ে আছে অবলীলায়। তবে এ কথা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, নজরুলের কবিতা ও গান যতখানি স্বদেশচেতনার স্বাক্ষর বহন করে কথাসাহিত্য সে তুলনায় দুর্বল।

## গ্রন্থপঞ্জি


১. ওয়াকিল আহমেদ (সম্পাদনা)
২০০০, কাজী নজরুল ইসলাম : জন্ম শতবর্ষ; বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি; ঢাকা

২. আতোয়ার রহমান
১৯৯৪: নজরুল বর্ণালী: নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা

৩. আবদুল মান্নান সৈয়দ
১৯৭৭; নজরুল ইসলাম কবি ও কবিতা; নজরুল একাডেমী; ঢাকা

৪. কল্পতরু সেনগুপ্ত
২০০০; কাজী নজরুল ইসলাম : জন্ম শতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ; পশ্চিমবাংলা, বাংলা আকাদেমি, কলকাতা।

৫. কাজী মোহম্মদ এহিয়া
১৯৯৭; সার্বজনীন নজরুল; ঢাকা।

৬. নীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায়

*Dhaka University Institutional Repository*

১৯৮৭; নজরুল-প্রভাকর; হসন্তিকা প্রকাশিকা; কলকাতা

৭. রফিকুল ইসলাম

১৯৮২; কাজী নজরুল ইসলাম : জীবন ও কবিতা : মল্লিক ব্রাদার্স, ঢাকা।

৮. রাজিয়া সুলতানা

১৯৬৯; নজরুল অন্বেষা, মখদুমী এন্ড আহসানউল্লা লাইব্রেরী; ঢাকা।

৯. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম

১৯৮৩; সমকালের নজরুল ইসলাম: শিল্পকলা একাডেমী; ঢাকা

১০. মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ

১৯৮১; সাহিত্যের রূপকার : ইসলামিক ফাউন্ডেশন; ঢাকা।

১১. মোবাশ্বের আলী

১৯৬৯; নজরুল-প্রতিভা; স্টুডেন্ট ওয়েজ; ঢাকা

১২. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (সম্পাদিত)

১৯৭২; নজরুল সমীক্ষা; ঢাকা

১৩. শাহবুদ্দিন আহমেদ

১৯৭৬; নজরুল সাহিত্য বিচার; মুক্তধারা; ঢাকা।

১৪. সফিকুন্নবী সামাদী

২০০১; নজরুলের গান: কবিতার স্বাদ; জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশ; ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

# নজরুল সঙ্গীতে স্বদেশচেতনার স্বরূপ

বাংলা সঙ্গীতের ইতিহাসে কাজী নজরুল ইসলামের অবদান সম্পর্কে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। বাংলা সঙ্গীত গবেষকদের ধারণা কবি নজরুল-এর চেয়েও গীতিকার ও সুরকার নজরুল অনেক বড়। অর্থাৎ নজরুল-প্রতিভা সঙ্গীতের ক্ষেত্রে যতটা অবদান রেখেছে আর কোনো শাখায় ততটা নয়। এ প্রসঙ্গে 'জন-সাহিত্য' অভিভাষণে নজরুল নিজেই বলেছেন- 'কাব্যে ও সাহিত্যে আমি কি দিয়েছি জানি না। আমার আবেগে যা এসেছিল সহজ ভাবে বলেছি। আমি যা অনুভব করেছি তাই আমি বলেছি। ওতে আমার কৃত্রিমতা ছিল না। কিন্তু সঙ্গীতে যা দিয়েছি, সে সম্বন্ধে আজ কোনও আলোচনা না হলেও ভবিষ্যতে যখন আলোচনা হবে, ইতিহাস লেখা হবে, তখন আমার কথা সবাই স্মরণ করবেন এ বিশ্বাস আমার আছে'। নজরুলের আত্মসচেতনতার প্রমাণ এ কথাগুলো।

বাংলা সঙ্গীতের ধারায় দেশাত্ববোধক বা স্বদেশচেতনামূলক গান বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। বহুমুখী বাংলা সংগীত-প্রতিভা নজরুল দেশাত্মবোধক গানের এই ধারায় রেখেছেন অবিস্মরণীয় অবদান। দেশাত্মবোধের নানা উপধারায় তিনি যেমন অসংখ্য গান লিখেছেন তেমনি বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায় এই গানগুলোর বাণী ও সুরের ক্ষেত্রে। একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ছাড়া বাংলা ভাষার আর কোনো সঙ্গীতকার স্বদেশচেতনামূলক গানে এই সাফল্য দেখাতে পারেননি। নজরুল সঙ্গীতের নানাদিক নিয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন ড. করুণাময় গোস্বামী। এমনকি নজরুলের দেশাত্মবোধক গান নিয়েও তিনি উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেছেন। কাজেই **নজরুল সঙ্গীতে স্বদেশচেতনার স্বরূপ** আলোচনা করতে গিয়ে আমরা তাঁর 'নজরুলগীতি প্রসঙ্গ'-এর সহায়তা পেয়েছি বার বার— একথা সকৃতজ্ঞচিত্তে প্রথমেই স্বীকার করে নেয়া ভাল।

তা সত্ত্বেও এ অভিসন্দর্ভের পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে আলোচিত হয়েছে 'বাংলা গানে স্বদেশচেতনার উৎস', স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাস, 'নজরুলের স্বদেশচেতনার উৎস' প্রভৃতি বিষয়। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা নজরুলের স্বদেশচেতনামূলক গানগুলোকে বিভিন্ন উপ-বিভাগে ভাগ করে, সেগুলোর বিষয় বাণী, সুর ও উৎস সম্পর্কে আলোচনার চেষ্টা করবো। তবে তার পূর্বে নজরুলের দেশাত্মবোধক গান সম্পর্কে সাধারণ ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রয়োজন।

আলোচনার শুরুতেই কয়েকজন আলোচক-গবেষকের নজরুলের স্বদেশচেতনামূলক সঙ্গীত বিষয়ে মন্তব্য উপস্থাপন করা হল—

> পরাধীন ভারতবাসীর প্রতিরোধ অতি উগ্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে যাঁর মধ্যে তাঁর নাম কাজী নজরুল ইসলাম। তাঁর সঙ্গীতের প্রকৃতি আলাদা। তাঁর

*Dhaka University Institutional Repository*

অনুভূতির পরিমণ্ডল অনেক ব্যাপক। জাতীয় জীবনের নানা স্তরে পুঞ্জীভূত পাপ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুন জ্বলেছে সে পরিমণ্ডলে। ভারত মনের ব্যথা-বেদনার উগ্ররসে তাঁর হৃদয় পাত্রটি হয়ে উঠেছে ভরপুর।

(প্রভাতকুমার গোস্বামী; ১৩৭৬; ৩৪)

তাঁর দেশাত্মবোধক কবিতা— বিশেষ করে গানগুলি সেদিন তরুণ রক্তে আগুণ জ্বালিয়ে দিয়েছিল: তাঁর মতো রক্ত লিখায় শোষকের সর্বনাশ ডাকতে আর কেউ পারেননি, আর এমন গভীর সহমর্মিতায় কেউ বাণী দিতে পারেননি শোষিতের বেদনাকে। নজরুল বাংলা সাহিত্যে নিপীড়িত মানবাত্মার প্রথম সার্থক কবি। এই দিক থেকে এবং তাঁর অসংখ্য গানের মধ্য দিয়ে নজরুল বাঙালীর কাছে চিরপ্রিয় হয়ে থাকবেন।

(সৌমেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়; ১৩৮৪; ১৬)

বাংলা দেশাত্মবোধক গানের ধারায় স্বর্ণোজ্জ্বল অবদানের জন্য কাজী নজরুল ইসলাম স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর গান বিপুলতা, বৈচিত্র্য ও গভীরতার জন্য সমসাময়িক কালে যেমন অভিনন্দিত হয়েছে, পরবর্তী কালেও তা বাঙালি দেশাত্মবোধক গীত রচয়িতাদের অনুপ্রাণীত করেছে। ভাষায় সুরে ও ছন্দে কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর দেশাত্মবোধক গীতমালাকে এমন এক পর্যায়ে উন্নীত করেছিলেন যে, তা শুধু সমকালীন আকাঙ্খাকেই পরিতৃপ্ত করেনি, দেশচেতনার স্থায়ী অনুভবকেও ধারণ করতে সক্ষম হয়েছে। ... রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল বা অতুল প্রসাদের স্বদেশ সঙ্গীতের মতো নজরুলের দেশাত্মবোধক গানও বাঙালির চিরকালীন স্বদেশ সঙ্গীতে পরিণত হয়েছে।

(করুণাময় গোস্বামী, ১৯৯৬ (১৯৭৯); ১১৫)

নজরুল জাতীয় ভাবোদ্দীপক, দেশপ্রেমমূলক গানও বিস্তর লিখেছেন। তার ভিতর একক (সোলো) ও সম্মেলক (কোরাস)— এই দুই বর্গের গানই আছে। এই পর্যায়ের কয়েকটি প্রসিদ্ধ গান হলো— কারার ঐ লৌহকপাট ভেঙ্গে ফেল কররে লোপাট; এই শিকল পরা ছল আমাদের শিকল পরা ছল: তোরা সব জয়ধ্বনি কর; আজি রক্ত নিশি ভোরে; দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার হে, ইত্যাদির মধ্যে শেষে কোরাস গানটি নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম এমন কোরাস গান লাখে না মিলায় এক।

(নারায়ণ চৌধুরী; ১৯৮৬; ৯৮)

*Dhaka University Institutional Repository*

> নজরুলের স্বদেশী গানের ছত্রে-ছত্রে যে পরিপূর্ণ-আত্মবিশ্বাসের সুর ধ্বনিত হয়েছে, পরাধীনতার নাগপাশে বাঁধা নির্জীব দেশবাসীকে উদ্দীপিত তথা উজ্জীবিত করার আহ্বান শোনা গেছে, তা পৃথক ভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয় না। তাঁর কারার ঐ লৌহ কপাট; চল্ চল্ চল্ উর্ধ্বে গগনে বাজে মাদল; দুর্গমগীরি কান্তার মরু; আমরা শক্তি আমরা বল; এই শিকল পরা ছল মোদের; মোরা ঝঞ্ঝার মতো উদ্দাম প্রভৃতি উদ্দীপক গানগুলির ভাব, ভাষা ও সুর শুনলে রক্ত টগবগ করে ওঠে।
>
> (নীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায়; ১৯৮৭; ১৯)

> নজরুল ইসলাম বিদ্রোহের কবি আবার সুরেরও কবি। বিদ্রোহের গানে তাই তাঁর ফুটে উঠেছে ভাঙ্গার আবেগ, বাঁধন ছেঁড়ার প্রবণতা আবার সুরের কবি নজরুলের সুরের সৃষ্টিতে পরিস্ফুটিত হয়েছে সৌন্দর্যময় পৃথিবী ও ঐক্যের পৃথিবীর আর একটি চিত্র। দারিদ্রের কবি নজরুলের বিদ্রোহমূলক গানের পশ্চাতে ছিলো তাঁর সাম্যের বাণী, ঐক্যের ধ্যান, শোষণভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে ফেলে নতুন করে সমাজ গড়ার স্বপ্ন। তাই তাঁর বিদ্রোহমূলক এবং স্বদেশী চেতনার গানগুলিতে ফুটে উঠেছে বিদ্রোহের সুর এবং পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙ্গার হুংকার।
>
> (বুদ্ধদেব রায়; ১৯৯০; ৪৫)

সমালোচকগণের উল্লেখিত আলোচনা থেকে তিনটি বিষয় অন্তত স্পষ্ট। আর তা হচ্ছে—

১. নজরুল বৈচিত্র্যধর্মী অনেক দেশাত্মবোধক গান রচনা করেছেন।
২. তাঁর দেশাত্মবোধক গান পরাধীন ভারতবাসীকে উজ্জীবিত করেছে স্বাধীনতার স্বপ্নে।
৩. বাংলা দেশাত্মবোধক গানের ধারায় নজরুল প্রতিভা-অনন্য সাধারণ।

ষোল শতকের শুরুতে শ্রীচৈতন্যদেব (১৪৮৬-১৫৩৩) বাংলায় যেমন প্রেমধর্মের জোয়ার বইয়ে দিয়েছিলেন এবং এই জোয়ারে ভরে গিয়েছিল বৈষ্ণব গীতিকবিতা, পদাবলী কীর্তন। নজরুল তেমনি বিশ শতকে স্বদেশপ্রেমের জোয়ারে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন বাংলা সঙ্গীত। তিনি শুধু নিজেই স্বদেশচেতনামূলক সঙ্গীত রচনা করেননি, অন্যদেরকে অনুপ্রাণীতও করেছেন। যার ফলে পরবর্তীকালে বাংলা গণসংগীত ধারার সূচনা সম্ভব হয়েছিল। তবে শ্রী চৈতন্যদেবের সঙ্গে নজরুলের একটি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। আর তা হল চৈতন্যদেব নিজে এক লাইন না লিখেও মানুষকে উজ্জীবিত করতে পেরেছিলেন আর নজরুল লিখে, গেয়ে পত্রিকা প্রকাশ করে বক্তৃতা দিয়ে মানুষকে শৃঙ্খল ও শোষণ মুক্তির আহ্বান জানিয়েছেন। নজরুল ১৯২০ সাল থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত রচনা করেছেন দেশাত্মবোধক

*Dhaka University Institutional Repository*

গান। অর্থাৎ মাত্র এক যুগ বা তার বেশি তিনি নিয়োজিত ছিলেন এই ধারার সঙ্গীত সাধনায়। (কোনো কোনো গবেষক এই সময়কালটিকে আরো সংক্ষিপ্ত করে ১৯২০-১৯২৬ পর্যন্ত উল্লেখ করেছেন যৌক্তিক কারণেই)। যদিও ১৯৪২ সালে চীনা নেতার আগমন উপলক্ষে 'চীন ও ভারতে মিলেছি আবার' গানটি রচনা করেন বলে গবেষক করুণাময় গোস্বামী জানিয়েছেন।

নজরুলের দেশাত্মবোধক গানের সংখ্যা ঠিক কত — আজ আর এই রহস্য ভেদ করা সম্ভব নয়। কেননা অযত্ন আর কবির উদাসীনতায় অসংখ্য গান হারিয়ে যে গেছে তাতে সন্দেহ নেই। যদিও নজরুলগীতির 'অখণ্ড দ্বিতীয় সংস্করণে এই সংখ্যা ১১৫ টি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বাস্তবে আরও অনেক বেশি হবে বলে গবেষকগণ মনে করেন। আমরা এই অভিসন্দর্ভের শেষে নজরুলের স্বদেশচেতনামূলক গানের যে তালিকা করেছি সেখানে ১৩৫টি গান স্থান পেয়েছে। এ তালিকাটিও পূর্ণাঙ্গ নয়। এখানে নজরুলের সঙ্গীতে স্বদেশচেতনার স্বরূপ আলোচনার উদ্দেশ্যে প্রথমেই তাঁর এই ধারার গানগুলোকে বিষয়ভিত্তিক শ্রেণীকরণ করতে আগ্রহী। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে নজরুল গবেষক করুণাময় গোস্বামী নজরুলের দেশাত্মবোধক গানগুলোকে ৭ টি ভাগে ভাগ করেছেন (নজরুলগীতি প্রসঙ্গ: ১২৫) এগুলো নিম্নরূপ —

১. দেশবন্দনামূলক গান

২. পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রামমূলক গান

৩. শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামমূলক গান

৪. নারী জাগরণমূলক গান

৫. মুসলিম জাগরণমূলক গান

৬. দেশাত্মবোধক ব্যঙ্গ গান

৭. সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামমূলক গান

এর সঙ্গে আমরা আরো কিছু বিষয় যোগ করতে পারি আর তা হচ্ছে —

৮. প্রকৃতি-নিসঃর্গ বন্দনামূলক গান

৯. আত্মশক্তি ও উদ্দীপনামূলক গান

১০.তরুণ-যুবা-ছাত্রদলের গান

১১.কোরাস বা মার্চের গান

১২.জাতীয় উন্নতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কমূলক গান। প্রভৃতি

শেষোক্ত পাঁচটি ভাগের অনেক গানই আবার করুণাময় গোস্বামী উল্লেখিত ৭টি ভাগের মধ্যে পড়ে। এই ভাগ গুলোর মধ্যে কোনো কোনোটিতে নজরুল অসংখ্য গান রচনা

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন। যেমন- পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রামমূলক গান। আবার কোনো কোনো শাখায় দু-একটি গান পাওয়া যায়। যেমন জাতীয় উন্নতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কমূলক গান।

## দেশবন্দনামূলক গান

সোজা কথায় দেশের প্রশস্তিমূলক গান-ই দেশবন্দনামূলক গান। নজরুল যে তাঁর মাতৃভূমি ভারতবর্ষকে প্রচণ্ড ভালবাসতেন এর প্রমাণ তাঁর এই ধারার গানগুলো। এখানে দেশের প্রতি তাঁর ভালবাসা আবেগ উৎকণ্ঠা আভাসিত হয়েছে বন্দনার মাধ্যমে। মানুষ যেমন ঈশ্বর বা গুরুবন্দনা করে নজরুল তেমনি গানের মধ্যদিয়ে মাতৃসম মাতৃভূমির বন্দনা করেছেন। তাঁর পূর্বেই বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, ডি এল রায় প্রমূখ এই ধারায় সঙ্গীত রচনা করেছেন। মূল বিষয় দেশবন্দনা হলেও এর মধ্যে দেশের গৌরববোধ, জন্মভূমির ঋণস্বীকার, শ্রদ্ধা প্রকাশ, মাটির প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ভালবাসা প্রভৃতি ফুটে উঠেছে। নজরুল এই দেশবন্দনামূলক গানগুলো যখন রচনা করেন প্রায় একই সময়ে পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রামমূলক গানও রচনা করেছেন। কিন্তু কী আশ্চর্য উভয় ধারার গানের বাণী ও সুরের মধ্য রয়েছে আশ্চর্য পার্থক্য। প্রথমটিতে শান্ত-সিগ্ধ-প্রশান্তির বাণী ও সুর দ্বিতীয়টিতে উচ্চগ্রামের সুরের পাশাপাশি বাণীর তেজদীপ্ততা। শুধু বিদ্রোহী বা বিপ্লবী সত্তায় নজরুলের যে প্রধান নয় এর বাইরেও 'শামলা বরণ বাংলা মায়ের' সোনার ছেলে তার অপরূপ রূপে যে মুগ্ধ তা প্রমাণ পাওয়া যায়। 'নজরুলের রচিত দেশবন্দনামূলক গানের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, এ গানের বাণীর অংশটি যথেষ্ট দীর্ঘ নয়। এখানে বাণীর প্রমিত গীতচিত দৈর্ঘ্য রক্ষা পেয়েছে। অনেক সংগ্রামী গানের ক্ষেত্রে নজরুল বাণীর প্রমিত দৈর্ঘ্য রক্ষা করতে পারেননি। সুর রচনাও রস সম্মতভাবেই এখানে কোমল এবং মধুর। 'আমার দেশের মাটি' গানটিতে বাউল সুরের ব্যবহার যেমন প্রাণ-মাতানো-তেমনি, 'উদার ভারত সকল মানবে' গানটিতে মিশ্র কানাড়ার প্রয়োগ অত্যন্ত মধুর, গভীর ও মর্মস্পর্শী' (করুণাময় গোস্বামী; ১৯৭৮ (১৯৯৬); ১২৮)।

নজরুলের দেশবন্দনার একটি উল্লেখযোগ্য গান --

একি অপরূপ রূপে মা তোমায় হেরিনু পল্লীজননী
ফুলে ও ফসলে কাঁদা মাঁটি জলে ঝলমল করে লাবণী ॥
রৌদ্রতপ্ত বৈশাখে তুমি চাতকের কাছে চাহ জল,
আম-কাঠালের মধুর গন্ধে জৈষ্ঠ্য মাতাও তরুতল।

এই গানের বাণী যেমন অসাধারণ সুরও তেমনি। গানের কথায় কবি প্রিয় মাতৃভূমি মাটি-কাদা-জল-ফসলের লাবণ্যে যে অপরূপ শোভা লাভ করেছে তা বর্ণিত হয়েছে, এমনকি বিভিন্ন মাসে এ দেশের ভূমি ও প্রকৃতি যে সান্নিধ্যের জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করে সে

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গও এসেছে। এভাবে কবি অসাধারণ মমতায় ও ভালবাসায় প্রিয় বাংলা মায়ের বন্দনা করেছেন। এরূপ দেশবন্দনামূলক বাংলা গান খুব কমই আছে।

এখানে দেশবন্দনামূলক কিছু গানের তালিকা দেয়া হল —

১. আমার শ্যামলা বরণ বাংলা মায়ের রূপ দেখে যা আয় রে আয়
২. আমার দেশের মাটি — ও ভাই খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি
৩. আমার সোনার হিন্দুস্থান ! দেশে দেশে নন্দিত তুমি
৪. একি অপরূপ রূপে মা তোমায় হেরিনু পল্লী-জননী
৫. এ দেশ কার? তোর নহে
৬. এই ভারতে নাই যাহা তা ভূ-ভারতে নাই
৭. এসো মা ভারত জননী আবার
৮. ও ভাই মুক্তি সেবক দল
৯. ওরে আজ ভারতের নব যাত্রা পথের
১০. কল-কল্লোলে ত্রিংশ কোটি- কণ্ঠে উঠেছে গান।
১১. কালের সঙ্গে বাজিছে আজও তোমারই মহিম', ভারতবর্ষ
১২. গঙ্গা সিন্ধু নর্মদা কাবেরী যমুনা ঐ
১৩. জননী মোর জন্মভূমি তোমার পায়ে নোয়াই মাথা
১৪. জবা-কুসুম সঙ্কাস রাঙ্গা অরুণ রবি
১৫. জয় ভারতী শ্বেত শতদল বাসিনী
১৬. ত্রিংশ কোটি তব সন্তান ডাকে তোরে
১৭. নম: নম: নম: বাংলাদেশ মম/ চীর মনোরম চীর মধুর
১৮. বাজে ওই বন্দনা প্রভৃতি
১৯. ভারত লক্ষ্মী মা আয় ফিরে — এ ভারতে
২০. ভূবনের নাম ! এ নব ভবনে তব আশীষ
২১. মাগো তোমার অসীম মাধুরী/ বিশ্বে পড়েছে ছড়ায়ে
২২. লক্ষ্মী মাগো এসো ঘরে। সোনার ঝাপি লয়ে করে
২৩. লক্ষ্মী মা তুই আয়গো উঠে সাগর জলে সিনান করি
২৪. স্বদেশ আমার ! জানি না তোমার শুধিব মা কবে ঋণ
২৫. স্বপ্নে দেখেছি ভারত জননী। তুই যেন রাজরাজেশ্বরী। প্রভৃতি।

Dhaka University Institutional Repository

## পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রামমূলক গান

দেশাত্মবোধক বাংলা সঙ্গীতে নজরুলের সবচেয়ে বড় অবদান মূলত তাঁর পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রামমূলক গানে। বাংলা সঙ্গীতের ইতিহাসে আর কোনো শিল্পীই এ ক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে তুলনীয় নয়। শৈশব থেকে নজরুল মানসে স্পর্শ করেছিল পরাধীনতার গ্লানী। আর তাই বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে, সামাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে তিনি বার বার প্রতিবাদ জানিয়েছেন তাঁর কবিতায় ও গানে। সে সময়ে ভারত মানসে বৃটিশ বিরোধী তথা পরাধীনতা বিরোধী যে মানসিকতা দানাবেধে উঠেছিল তারই বাস্তব প্রকাশ নজরুলের গানে লক্ষ করা যায়। নজরুল তাঁর এই গানগুলির মধ্যে যেমন বিদ্রোহের এক জোয়ারে ভাসিয়ে নিয়ে গেছেন। তেমনি শৃঙ্খল মুক্তির সংগ্রামে অনুপ্রাণীত করেছেন স্বদেশবাসীকে। তাঁর মতো আর কেউ সেদিন বাঙালিকে এভাবে উদ্দীপ্ত করতে পারেননি, পারেননি স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর করতে। এই গানগুলোতে শব্দ নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোমল, হ্রস্য উচ্চারণযুক্ত শব্দ বাদ দিয়ে উচ্চ গ্রামের ওজোগুন সম্পন্ন ভারি মহাকাব্যিক তৎসম শব্দ প্রয়োগ করেছেন। ফলে যেমন বাণীর তেজোদীপ্ততা বেড়েছে। তেমনি সুরও তার স্বাভাবিক মাত্রা ছেড়ে উচ্চপদে আহরণ করেছে। গানগুলো আয়েতনের দিক থেকেও বেশ দীর্ঘ। প্রথমেই কিছু শব্দ নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। যেমন—

> কারা, লৌহ, কপাট, শিকল, তরবারী, অভ্রভেদী, গণ্ডমুক্ত, মিথ্যাসূদন, আত্মশক্তি, উদ্দাম, ঝঞ্জা, দুর্গম, কান্তার, শঙ্খ, শঙ্কাশূণ্য, নিশান, বজ্র, যাত্রী, বাঁধন প্রভৃতি।

এখানে কয়েকটি বিদেশী শব্দ বাদ দিলে বেশির ভাগই তৎসম এবং ওজোগুন সম্পন্ন অর্থ ও ধ্বনি তাৎপর্যময় শব্দ। এখানে লোহা প্রয়োগ না করে লৌহ, দরোজা হয়েছে কপাট, পতাকা হয়েছে নিশান প্রভৃতি অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেয়া যায়। নজরুল সচেতন শিল্পী বলেই বিদ্রোহের এই গানগুলোতে 'লাল পতাকা' না লিখে 'লাল নিশান' লিখেছেন। সম্ভবত নজরুলের দেশাত্মবোধক গানের মধ্যে এই ধারার গান-ই সর্বাধিক। এই ধারার গান রচনায় নজরুলের সফলতা একটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে, নজরুল তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার পরিমণ্ডল থেকে যে আবেগে ঋদ্ধ হয়েছেন এখানে তাই-ই তুলে ধরেছেন। সাংবাদিক ছিলেন, বিদ্রোহমূলক কাব্য রচনা করেছেন, জেল খেটেছেন, রাজনীতি করেছেন, গ্রাম থেকে গ্রামে ঘুরে বেড়িয়েছেন। কাজেই এ গানগুলো যেন 'প্রাণের গভীর থেকে উৎসারিত'। এখানে 'কারার ঐ লৌহ কপাট/ ভেঙ্গে ফেল কররে লোপাট/ রক্ত জমাট শিকল পূজার পাষাণ বেদী' গানটির প্রসঙ্গে বলা যায়— দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস 'বাঙলার কথা' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করতেন সেই সময় তাকে বৃটিশ সরকার বন্দি করে জেলে পাঠিয়ে দেয়। তার স্ত্রী বাসন্তী দেবী তখন পত্রিকাটি সম্পাদনার ভার নেন। তার অনুরোধে নজরুল এই গানটি লিখে দেন 'বাঙলার কথা'র জন্য। যা ২০ জানুয়ারি ১৯২২

*Dhaka University Institutional Repository*

সালে প্রকাশিত হয়। পরে লেখাটি 'ভাঙ্গার গানে' স্থান পায়। এই ধারার আরেকটি উল্লেখযোগ্য গান 'ঐ অভ্রভেদী তোমার ধ্বজা উড়লো' এবং 'এ কোন পাগল পথিক ছুটে এল' গান দুটি কুমিল্লায় রচনা করেন। 'সে সময়টা ছিল অসহযোগ আন্দোলনের যুগ। কুমিল্লায়ও তার ঢেউ এসে লেগেছে, সভা, শোভাযাত্রা আর আন্দোলনে কুমিল্লা তখন মুখর। নজরুল কুমিল্লার রাস্তায় মিছিলে যোগদান করে গাইলেন, 'এ কোন পাগল পথিক ছুটে এল বন্দিনী মার আঙ্গিনায়'। গানটি বিষের বাঁশী'তে সংকলিত' (রফিকুল ইসলাম; ১৯৭২: ১৬৭)। 'শিকল পরার ছল' গানটি লিখেছিলেন হুগলী জেলে বসে। এ সময় তিনি অনসন ধর্মঘটও করেছিলেন। 'দুর্গম গীরি কান্তার মরু' কবির একটি উল্লেখযোগ্য গান। এটি একই সঙ্গে বিদ্রোহ এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির গান।

পরাধীনতার বিরুদ্ধে নজরুলের সংগ্রামীচেতনা প্রকাশ পেয়েছে বহু গানে। কখনো সরাসরি কখনো বা পরোক্ষভাবে। মানুষকে কোনো চেতনায় উদ্দীপ্ত করাও যে মহান গুণ তা নজরুলের এই গানগুলোর মধ্যেই আভাসিত হয়েছে। ১৯২৪ সালে হুগলীতে গান্ধীজীর অভ্যর্থনায় দুটি গান করেন নজরুল। স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত হলেও এর মধ্যে পরাধীনতার শেকল ছেঁড়ার আহ্বান আছে—

১. আজ না চাওয়ার পথ দিয়ে কে এল
ঐ কংস-কারার দ্বার ঠেলে।

২. ঘোররে আমার সাধের চরকা ঘোর
ঐ স্বরাজ রথের আগমনী শুনি চাকার শব্দে তোর।

'বিশের বাঁশীর' 'বন্দী-বন্দনা' গানটি ১৩২৮ সালে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। মল্লার রাগ উল্লেখিত এই দীর্ঘ গানটি নজরুল ১৯২১ সালে কুমিল্লায় রচনা করেন। 'স্বাধীনতার জয় এবং কারাবন্দীদেরকে দেশচেতনায় উদ্দীপ্ত করার একটি অপূর্ব গান। গানটির কিছু অংশ তুলে দেয়া হল—

আজ রক্ত নিশি ভোরে / এ কি শুনি ওরে
মুক্তি কোলাহল বন্দী শৃঙ্খলে / কাহারা কারা বাসে
মুক্তি হাসি হাসে / টুটিছে ভয় বাঁধা স্বাধীন হিয়া তলে ॥

নজরুল স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখতেন বলেই প্রিয় মাতৃভূমিকে শৃঙ্খলমুক্ত করার প্রয়াসে গান রচনা করেছেন। 'ভারতবর্ষের রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম তথা বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সংগঠিত সংগ্রামের পটভূমিতে রচিত হলেও নজরুল ইসলামের এই সংগ্রামী সংগীতমালার আবেদন তাতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে নির্ভয়ে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার কালাতিক্রমী প্রেরণার রূপায়ণ ঘটেছিল এই সব গানে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সকল স্তরে

*Dhaka University Institutional Repository*

নজরুলের এ সব সংগ্রামী সংগীত মানুষকে অনুপ্রাণীত করেছে' (করুণাময় গোস্বামী: পূর্বোক্ত: ১৩২)। আর এখানেই সম্ভবত নজরুলের স্বদেশচেতনামূলক গানের শাশ্বত বৈশিষ্ট্য যা কাল থেকে কালান্তরের মানুষকে অনুপ্রাণীত করতে পেরেছে। স্থান-কালের উর্ধ্বে উঠে স্বাধীনতার, মানবতার মুক্তির বাণী শুনিয়েছে।

নজরুলের পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রামমূলক গানের তালিকা

১. আজ না চাওয়া পথ দিয়ে কে এল
২. আজি রক্ত নিশি ভোরে
৩. (আজ) ভারত-ভাগ্য বিধাতার বুকে
৪. আজ ভারতের নব আগমনী
৫. আজি শৃঙ্খলে বাজিছে মাভৈঃ –বরাভয়
৬. এই শিকল পরা ছল মোদের এ শিকল পরা ছল
৭. এসো এসো এসো ওগো মরণ
৮. কারার ঐ লৌহ-কপাট
৯. ঘোররে আমার সাধের চরকা ঘোর
১০. জননী ! জননী ! আবার জাগো শুভ্র শারদ প্রাতে
১১. বন্দী তোমায় ফন্দি-কারার গণ্ডী-মুক্ত বন্দী-বীর।
১২. বন্দীর মন্দিরে জাগো দেবতা
১৩. বাজাও প্রভু বাজাও ঘন বাজাও
১৪. বল ভাই মা-ভৈঃ, মা-ভৈঃ
১৫. ঐ অভ্র-ভেদী তোমার ধ্বজা
১৬. এ কোন পাগল পথিক ছুটে এল
১৭. বল নাহি ভয়, নাহি ভয়
১৮. তোরা সব জয়ধ্বনি কর
১৯. এসো বিদ্রোহী মিথ্যাসূদন
২০. টলমল টলমল পদভরে
২১. শঙ্কা শূণ্য লক্ষ কণ্ঠে বাজিছে শঙ্খ ঐ
২২. শিকল যাদের উঠিছে বাজিয়া বীরের মুক্তি তরবারি। ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

## শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামমূলক গান

নজরুল তাঁর সাহিত্যে যেমন সামাজিক শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন সঙ্গীতেও তেমনি। তাঁর কাব্যগুলোর নামের মধ্যেই রয়েছে শ্রেণীচেতনা তথা শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। যেমন — সাম্যবাদী, সর্বাহারা প্রভৃতি। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শোষণ তখনও ছিল এখনও আছে। কিন্তু নজরুলের কালে এই শোষণ ছিল সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এবং তার প্রতিভূ সামন্তদোষরদের শোষণ। বৃটিশ-ভারতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে এই শোষণকে স্থায়ীরূপ দেয়া হয়। নজরুল তাঁর অনেক গানে শোষণের বিরুদ্ধে বিশেষ করে শোষণমুক্ত সমাজ গড়ার সংকল্পের কথা বলেছেন। বাংলার নিপীড়িত-লাঞ্ছিত-বঞ্চিত-শোষিত মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির শ্লোগান দিয়েছেন। শুধু এখানেই তাঁর সাম্য আকাঙ্খার শেষ নয়। ভারতের ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে জাত-পাত ভেদা-ভেদের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সোচ্চার —

গাহি সাম্যের গান
যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান,
যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম ক্রীশ্চান।

(সাম্যবাদী)

নজরুলের পূর্বে এই বাণী আমরা আর কোথাও শুনিনি।

সমাজতন্ত্রবাদী কমরেড মজফফর আহমদর সঙ্গে নজরুলের ঘনিষ্টতা ও সাংবাদিকতার সম্পর্ক থাকলেও তিনি নিজে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করতেন কী-না তা স্পষ্ট নয়। তবে সাম্যবাদে তাঁর যে প্রেরণা ছিল তা সাহিত্য-সঙ্গীত থেকে বোঝা যায়। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে ১৯১৭ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হওয়ার পর পৃথিবীর মেহনতি মানুষের মধ্যে এক ধরণের প্রত্যাশার আলো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। আর সেই আলো যে নজরুলকে স্পর্শ করবে তাতে সম্ভবত অবাক হবার কিছু নেই। সে সময়ে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল খুবই খারাপ, তারপর রয়েছে শ্রমজীবি কৃষক-শ্রমিকের প্রতি অর্থনৈতিক শোষণ। 'এই পর্যায়ে নজরুল অত্যন্ত বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিলেন শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামমূলক গানে। চল্লিশের দশকের সূচনায় সাম্যবাদী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রবাহে এই চেতনার গানের নাম হয় গণসংগীত। (করুণাময় গোস্বামী; মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ সম্পাদিত জাতীয় পর্যায়ে নজরুল জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন স্মারক গ্রন্থ ১৯৯৩; ৪৬)। নজরুল নিজে রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হন ১৯২৫ সালে। তাঁর রাজনীতির প্রধান দর্শনই ছিল কৃষক-শ্রমিক-জেলে-মজুরসহ সব শ্রমজীবী মানুষকে সংঘবদ্ধ করা। তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা। তার 'লেবার স্বরাজ পার্টির মুখপত্র 'লাঙ্গল'-এর প্রধান পরিচালক ছিলেন নজরুল নিজে। পরবর্তীকালে এই নাম পরিবর্তন করে দলের নাম করেন 'বঙ্গীয় কৃষক-শ্রমিক দল'। কাজেই সর্বহারা শ্রমিকের পক্ষে কাজ করার অন্তঃতাগিদ

*Dhaka University Institutional Repository*

নজরুলের ভেতরে বরাবর-ই ছিল। তাই স্বাভাবিক ভাবেই তা সঙ্গীতে রূপ লাভ করেছে। এই ধারার বেশির ভাগ গানই ১৯২৫ সালে রচনা করেন নজরুল। এ ক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার 'বিশ্ববিশ্রুত ইন্টারন্যাশনাল' গানেরও প্রথম ভারতীয় তর্জমার কৃতিত্ব তাঁর। তিনি এর নাম দেন "আন্তর ন্যাশনাল" সঙ্গীত— জাগো অনশন-বন্দী ওঠরে যত / জগতের লাঞ্ছিত ভাগ্য হত, ইত্যাদি। গানটি ভীমপলশ্রী সুরে বাঁধা, অপ্রতিরোধ্য সেই সুরের আবেদন' (নারায়ণ চৌধুরী: ১৯৮৬: ৯৮)। 'ইন্টারন্যাশনাল সঙ' মূল গানটি ফরাসি শ্রমিক কবি ইউজিন পাতিয়ের রচনা করেছিলেন। যার প্রথম লাইনটি ছিল—

Arise, ye prisoners of starvation

Arise, ye wretched of the earth.

এই গানটি সম্পর্কে 'স্মৃতিকথায়' মুজফফর আহমদ লিখেছেন— 'নজরুল ইসলাম ইনটারন্যাশনাল সঙ্গীতের নাম দিয়েছে আন্তর-ন্যাশন্যাল সঙ্গীত। হয়তো সকলে জানেন যে ইনটারন্যাশন্যাল সঙ্গীতের একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে। এই গানটির ভিতর দিয়েই মজুর শ্রেণীর আন্তর্জাতিকতা বিশেষভাবে ফুটে ওঠে। সারা দুনিয়ার মজুর শ্রেণীর মধ্যে যে একটা সংঘবদ্ধতা আছে তাও প্রকাশ পায় এই গানটির ভিতর দিয়ে' (মুজফফর আহমদ; ১৯৬৫ (১৯৯৮); ৯৮)। গানটির শেষ প্রান্তে কোরাসে গাওয়া হয়েছে—

নব ভিত্তি পরে
নব নবীন জগৎ হবে উত্থিত রে।
শোন অত্যাচারী ! শোন রে সঞ্চয়ী।
ছিনু সর্বহারা, হব সর্বজয়ী ॥

এর মধ্যদিয়ে কবি শোষিত মানুষের বিজয় ঘোষণা করেছেন; কবির প্রত্যাশা একদিন অত্যাচারী-সঞ্চয়ীর পতন ঘটবেই।

নজরুল তাঁর 'সর্বহারা' গ্রন্থে কৃষক-শ্রমিক-জেলেদের নিয়ে গান লিখেছেন। সেখানে শোষিত মানুষকে উজ্জীবিত করতে গিয়ে নজরুল দেশের অসহায় অবস্থার কথা বলেছেন, নিজে স্বদেশচেতনাকেই তুলে ধরেছেন—

ওঠ্‌রে চাষী জগদ্বাসী ধর ক'ষে লাঙ্গল।
আমরা মরতে আছি-ভাল করেই মর্‌ব এবার চল ॥
মোদের উঠান-ভরা শস্য ছিল হাস্য-ভরা দেশ
ঐ বৈশ্য দেশের দস্যু এসে লাঞ্ছনার নাই শেষ,
ও ভাই লক্ষ হাতে টানছে তারা লক্ষ্মী মায়ের কেশ,
আজ মা' র কাঁদনে লোনা হল সাত সাগরের জল ॥

(কৃষাণের গান; সর্বহারা)

*Dhaka University Institutional Repository*

নজরুল বাংলার কৃষককে যেমন তার শক্তির প্রতীক লাঙল চেপে ধরতে বলেছেন, তেমনি 'শ্রমিকের গানে' হাতুড়ি-শাবল ধরতে বলেছেন—

ওরে ধ্বংশ পথের যাত্রীদল।
ধর হাতুড়ি, তোল কাঁধে শাবল ॥
আমরা হাতের সুখে গড়েছি ভাই,
পায়ের সুখে ভাঙ্গাবো চল্।
ধর হাতুড়ি তোল কাঁধে শাবল ॥

১৯২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বঙ্গীয় প্রজা সম্মিলনীর অধিবেশন উপলক্ষে কৃষ্ণনগরে এই গান দুটি রচিত হয়। একই বৎসর মাদারীপুর অনুষ্ঠিত নিখিল বঙ্গ ধীবর সম্মিলনের অধিবেশনে নজরুলের 'ধীবরদের গান'টি গাওয়া হয়। এই সময় শ্রমিকদের আন্দোলন ও ঐক্যের প্রেক্ষিতে ধীবর বা জেলেও অন্যান্য উপেক্ষিতরাও সংগঠিত হবার উদ্যোগ নেয়। নজরুল তাঁদের উদ্দেশ্যেও প্রেরণা ও আশার বাণী উচ্চারণ করেছেন—

আমরা নিচে পড়ে রইব না আর
শোন রে ও ভাই জেলে,
এবার উঠবো রে সব ঠেলে
ঐ বিশ্ব-সভায় উঠলো সবাই রে,
ঐ মুটে-মজুর হেলে
এবার উঠবো রে সব ঠেলে ॥

নজরুলের শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামমূলক আরও— গান আমরা পাই 'ফণি-মনসা'য়—

ওড়াও ওড়াও লাল নিশান !
দুলাও মোদের রক্ত পতাকা . . .
শীতের শ্বাসেরে বিদ্রুপ কবি ফোটে কুসুম,
নব-বসন্ত সূর্য উঠছে টুটিয়া ঘুম . . . .
(রক্তপতাকার গান)

সর্বহারা শ্রেণীর বিজয়ের এই গানটি অনেকটা রূপকাশ্রিত। এ ছাড়াও ইংরেজ কবি শেলীর ভাবানুবাদ করে নজরুল রচনা করেছেন— 'জাগর-তূর্য' গানটি—

ওরে ও শ্রমিক সব মহিমার উত্তর-অধিকারী
অলিখিত যত গল্প-কাহিনী তোরা যে নায়ক তারি ॥

এরূপ আরও কিছু গানের সন্ধান পাই আমরা যেখানে বাংলার শোষিত মানুষের কথা স্থান পেয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য—

*Dhaka University Institutional Repository*

১. অত্যাচার আর উৎপীড়নে যে আজিকে আমরা পর্য্যুদস্ত,
ভয় নাই ভাই . . .
কি ভয় বন্দী নিঃস্ব যদিও, আমরা আঁধারে পরিত্যক্ত,
২. দুঃখ সাগর মন্থন শেষ / ভারত লক্ষ্মী আয় মা আয়
. . .
চাই প্রাণ চাই ক্ষুধার অন্ন, / মুক্ত আলোকে মুক্ত কর ॥
৩. নব জীবনের নব উত্থান- / আজান ফুকারি এস নকীব্।
.....
জাগে গৃহহীন, জাগে পরাধীন, / জাগে মজলুম বদনসীব।
৪. ভূমিকম্পের প্রলয়-লীলায় সব হল ছারখার:
ভিক্ষার ঝুলি ছাড়া আজ ভাই সম্বল নাহি আর।

এই ধারার গানগুলো যে তৎকালীন সাম্যবাদী তথা সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে উদীপ্ত করেছে তাতে সন্দেহ নেই। একই সঙ্গে বিভিন্ন পরিস্থিতি তথা বাস্তবতায় গানগুলো রচিত হলেও এর মধ্যে ধ্বনিত হয়েছে শোষণমুক্তির সার্বজনীন সুর। যে সুরের রেশ ধরে পরে গণসংগীত এবং গণনাট্য সংঘের সূচনা হয়েছিল। এ দিক থেকে এ গানগুলোর সামাজিক-রাজনৈতিক মূল্যের পাশাপাশি বাংলা সঙ্গীতে নতুন ধারার (গণসঙ্গীত) আগমনকে উৎসাহিত ও তরান্বিত করেছে।

## নারী জাগরণমূলক গান

নজরুলের গানে দেশপ্রেম নানাভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে নারীজাগরণ বা বাংলার নারীদেরকে কুসংস্কারের অন্ধ কারা ভেঙ্গে আলোতে বেরিয়ে আসার প্রেরণামূলক গান সংখ্যায় বেশি না হলেও উল্লেখযোগ্য। আপাতভাবে নারীর মানবিক অধিকার তথা তার শৃঙ্খলিত জীবনের কথা থাকলেও এর মধ্য দিয়ে সঙ্গীতকার নজরুলের স্বদেশচেতনায়-ই প্রস্ফুটিত। শুধু গানেই নয় কবিতাতেও নজরুল আগেই বলেছেন—

বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর,
অর্ধেক তার আনিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর।

নজরুল জানতেন যে এ সমাজ যে পিছিয়ে আছে তার কারণ হচ্ছে অধিকার বঞ্চিত আমাদের নারী সমাজ। নারীরা সংসার-সমাজ শেকলে বন্দি থাকায় আমাদের অর্থনৈতিক মুক্তি লাভ হচ্ছে না। তাই তাদেরকে টেনে আনতে হবে সভ্যতার আলোয়। এই উপলব্ধি থেকে নজরুল নারী জাগরণমূলক স্বদেশী গান রচনা করেছেন। বাংলায় এ ধারার গান একেবারেই কম। তার মধ্যে নজরুলের একটি গান খুবই গুরুত্বপূর্ণ—

Dhaka University Institutional Repository

জাগো নারী জাগো বহ্নি শিখা ॥
জাগো স্বাহা সীমান্ত রক্ত টীকা ॥

এছাড়াও উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গান হচ্ছে— আমি মহাভারতী শক্তি নারী, চাঁদের কন্যা চাঁদ সুলতানা, কোন অতীতের আধার ভেদিয়া, যেথা দেবী শক্তি নারী অপমান সহে, গুনে গরিমায় আমাদের নারী আদর্শ দুনিয়ায়, জাগিলে পারুল কিগো সাত ভাই চম্পা ডাকে, মেলি শতদিকে শত লেলিহান রসনা প্রভৃতি। 'এ সব গান নারীদের পরমা শক্তির অংশ রূপে বর্ণনা করে কবি তাদের অনুপ্রাণীত করবার প্রয়াস পেয়েছেন। কোথাও বর্তমান কালের নারীদের অনুপ্রাণীত করতে ইতিহাসখ্যাত বীর রমণীদের প্রশস্তি করেছেন। জাগো নারী বহ্নি শিখা একটি প্রবল তেজময় সঙ্গীত। এর শক্তিদীপ্ত পৌরাণিক পূর্বোল্লেখ, বেগবান শব্দমালার সঙ্গে পরিপূরক খেয়াল অঙ্গের সুর গানটিকে এক দীপ্ত আহ্বানে পরিণত করেছে' (করুণাময় গোস্বামী; ১৯৭৮; ১৪৩)। নজরুলের 'জাগিলে পারুল কি গো' গানটি 'বুলবুল' এর ৩৮ নং গান। এটি পুরুষ শাসিত সমাজে মেধা ও পরিশ্রমে সবাইকে অতিক্রম করে অংকে প্রথম স্থান অধিকার করে ফজিলাতুন্নেসার বিদেশ যাত্রা উপলক্ষে রচিত। এই বিদূষী নারী যেন রূপকার্থে সাত ভাই চম্পার একমাত্র বোন পারুল। নজরুলের চেতনায় যে দেশ ছিল সে দেশের নারীরাও তাই ভাষা পেয়েছে তাঁর গানে, সুরে— এ কথা বলা যায় নির্দ্বিধায়।

## মুসলিম জাগরণমূলক গান

নজরুলের পূর্বে ধর্মীয় ঐতিহ্য ও চেতনাভিত্তিক জাগরণমূলক গান বলতে 'হিন্দু মেলা'র গাওয়া কিছু পাওয়া যায়। আর সেগুলো ছিল হিন্দু-জাগরণমূলক গান। নজরুল যখন সঙ্গীত রচনা করেন তখন অন্য কোনো উল্লেখযোগ্য বাঙালি মুসলমান গীতিকারের সন্ধান আমরা পাইনি। কাজেই নজরুলই সে মুসলিম জাগরণমূলক গান রচনার পথিকৃৎ হবেন বলার অপেক্ষা রাখে না। নজরুলের মুসলিম জাগরণমূলক সেই গানগুলো আমাদের আলোচ্য বিষয় যেখানে স্বদেশচেতনা প্রতিফলিত হয়েছে। অর্থাৎ মুসলিম আদর্শ, ঐতিহ্য, গৌরব গাঁথা থাকলেও তার মধ্যদিয়ে ভারতবর্ষের নিপীড়িত-শোষিত মানুষের (হোক সে মুসলমান) উজ্জীবনের স্বপ্ন বা প্রেরণা রয়েছে। নজরুলের এই গানগুলো মূলত প্রেরণা-উদ্দীপনার গান। প্রায় কাছাকাছি সময়ে নজরুল মুসলিম জাগরণমুলক কাব্য ও গান রচনা করেছেন— তাঁর কামালপাশা, আনোয়ার, রক্তভেরী কবিতাসহ জিঞ্জীর কাব্যের অধিকাংশ কবিতাই মুসলিম ঐতিহ্য ও জাগরণমূলক। অনেক অভিভাষণেও তিনি মুসলিম জাগরণের কথা জোর দিয়ে বলেছেন বার বার। তবে এই ধারার উল্লেখযোগ্য গানগুলো হচ্ছে—

১. আল্লা আমার প্রভু আমার নাহি নাহি ভয়

*Dhaka University Institutional Repository*

২. একি বেদনার উঠিছে ঢেউ দুর সিন্ধুর পারে
৩. খুশী লয়ে খোশরোজের আর খেয়ালী খোস-নসীব
৪. জাগো না সে জোশ লয়ে আর মুসলমান
৫. তওফিক দাও খোদা ইসলামে
৬. দিকে দিকে পুনঃ জ্বালিয়া উঠিছে দীন-ই-ইসলামী লাল মশাল
৭. ধর্মের পথে শহীদ যারা
৮. বাজিছে দামামা বাঁধরে আমামা
৯. ভূবন জয়ী তোরা কি হায় সেই মুসলমান
১০.সকাল হল শোনোরে আজান
১১.সালাম, সালাম, জামালউদ্দীন, আফগানী, তসলিম
১২.হাতে হাত দিয়ে আগে চল, হাতে নাই থাক হাতিয়ার

এছাড়াও 'গুনে গরিমায় আমাদের নারী আদর্শ দুনিয়ায়' গানটিকে গবেষক করুণাময় গোস্বামী মুসলিম জাগরণের গান হিশেবে বিবেচনা করলেও আমাদের মতে এটি নারী জাগরণের গান। কেননা, গানটিতে ইসলামের চেয়ে নারীর মূল্য ও গুরুত্বের ওপর জোর দেয়া হয়েছে।

নজরুল ইসলামী চিন্তা-চেতনা-ঐতিহ্য নিয়ে অনেক গান লিখলেও (আবদুল আজিজ আল-আমানের মতে দুই শতাধিক) এর মধ্যে অল্প গান-ই স্বদেশ-চেতনার সঙ্গে সম্পৃক্ত। নজরুলের এই গানগুলোতে মূলত ভারতবর্ষের শিক্ষায়, সাহিত্যে, জ্ঞানে-বিদ্যায়-অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া মুসলমানদেরকে উদ্দীপ্ত করার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। সধর্মী ভাইদেরকে টেনে তোলার আকাঙ্খা থেকে এ গানগুলো সৃষ্টি হয়েছে। "বিশ্ব মুসলিম সমাজের নবজাগরণের প্রেরণা ও বাংলার সমাজ বিন্যাসে হিন্দু-মুসলিম পরিস্থিতির ভারসাম্য রক্ষা— এই দুই বোধ থেকেই নজরুল মুসলিম জাগরণে কায়মনোবাক্য নিয়োজিত ছিলেন। নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি এক ঐতিহাসিক দায়িত্ববোধ থেকে নজরুল নানা ধরণের রচনায় এই আহ্বান ধ্বনিত করে তুলেছিলেন। গীত রচনা ছিল তার একটি অংশ বিশেষ" (করুণাময় গোস্বামী; ১৯৭৮; ১৪৬)

## দেশাত্মবোধক ব্যঙ্গ গান

বাংলা সাহিত্যে ব্যঙ্গরচনা অনেক থাকলেও ব্যঙ্গগানের সংখ্যা তেমন একটি উল্লেখযোগ্য নয়। সেই সঙ্গে দেশাত্মবোধসম্পন্ন ব্যঙ্গ গানের সংখ্যা আরও কম। ব্যঙ্গ গানে খোঁচা বা আঘাত থাকলেও এর মধ্য দিয়ে রচয়িতার স্বদেশানুরাগ আভাসিত হতে পারে। "ব্যঙ্গ গান আমাদের বোধ বা চৈতন্যের ওপর আঘাত দেয়। সে আঘাত উপভোগ্য। কারণ তার মধ্যে

*Dhaka University Institutional Repository*

হাস্যকর উপকরণ থাকে। মোহ, জড়তা, দুর্নীতি, দুর্বুদ্ধি অন্যায়, অত্যাচার, কুসংস্কার — সমাজ বা জাতীয়জীবন থেকে এ সব দূর করার ব্যাপারে এই 'উপভোগ্য আঘাত' একজন রাজনৈতিক নেতার বক্তৃতা বা একজন সমাজ সংস্কারকের উপদেশের চেয়ে কম উপযোগী নয়" (সৌম্যেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়; ১৩৮৪, তিন)। বাংলা সাহিত্যে ব্যঙ্গ কাব্যের সূচনা কবি ঈশ্বর গুপ্তের (১৮১২-৫৯) হাতে। তবে বাংলা গানে এই ধারার পথিকৃৎ এবং সফল রচয়িতা নিঃসন্দেহে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩)। একই সময়ে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, বেনোয়ারীলাল গোস্বামী, রজনীকান্ত সেন প্রমূখ খ্যাতিমান সাহিত্যিকগণও দেশাত্মবোধক ব্যঙ্গ কবিতা-গান রচনা করেছেন। 'বিশেষ করে স্বদেশী আন্দোলনের সময় লেখা বিজয়চন্দ্রের কয়েকটি সুন্দর ব্যঙ্গ কবিতা এবং রজনীকান্তের কয়েকটি অপূর্ব ব্যঙ্গসঙ্গীতে জাতীয়তাবোধের দেক থেকে এখনো কিছু চিন্তার খোরাক পাওয়া যায়। বিশ শতকের প্রথম চার দশকে কয়েকজন বিশিষ্ট কবি ও গীতিকারের দেশাত্মবোধক ব্যঙ্গ রচনায় নতুন প্রেরণার পরিচয় ফুটে ওঠে। এদের মধ্যে মুকুন্দ দাস, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, সতীশচন্দ্র ঘটক, বনবিহারী মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র পণ্ডিত, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য, কাজী নজরুল ইসলাম এবং বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য" (পূর্বোক্ত; পাঁচ)।

ব্যঙ্গগীতি বা রচনা মূলত কোনো বিশেষ সময়ের বা ঘটনা কেন্দ্রিক রচনা। কাজেই এর মধ্যে ধরা পড়ে একটি যুগের বিশেষ সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় অবস্থা; যাকে বিষয় করে (মূলত অসঙ্গতিকে) গীতিকারগণ গান রচনা করেন। সঙ্গীতকার কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর ব্যঙ্গগীতিতে সমকালের নানা ঘটনা ও অসঙ্গতিকে তুলে ধরেছেন সার্থক ভাবে। 'হাসির গানে'র রচয়িতা ডি এল রায়ের পর তাই এ ধারার অন্যতম সফল কবি নজরুল। "তাঁর হাসির গান রচনার আরম্ভ; কৈশোর কালে লেটোর দলের গান লেখার সময়ই। তারপর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর যেমন সিরিয়াস তেমনি হিউমারাস গান তিনি লিখেছেন অজস্র। রাজনৈতিক, সাম্প্রদায়িক, সামাজিক, ধার্মিক, প্রভৃতি কোনো বিষয়-ই বাদ পড়েনি তার তীর্যক দৃষ্টি থেকে। সেগুলির মধ্যে বেশিরভাগ-ই ব্যজস্তুতিমূলক তথা বিদ্রুপাত্মক" (নীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায়; ১৯৮৭: ৫৪)।

নজরুলের একটি উল্লেখযোগ্য ব্যঙ্গগান রবীন্দ্রনাথের গানের প্যারোডি —

তোমারই জেলে পালিছ ঠেলে
ধন্য তুমি ধন্য হে।
আমারই গান তোমারই ধ্যান
তুমি ধন্য ধন্য হে;
রেখেছ শাস্ত্রী পাহারা দোরে
আঁধার কক্ষে জামাই আদরে

*Dhaka University Institutional Repository*

বেঁধেছ শিকল প্রণয়-ডোরে
তুমি ধন্য, ধন্য হে ॥

এই ব্যঙ্গ গানটি নজরুল হুগলি জেলের জেলসুপারকে উদ্দেশ্য করে লিখেছেন যিনি সে সময়ে কয়েদিদের ওপর নির্মম অত্যাচার চালাতেন। এছাড়াও 'সায়মন কমিশনের রিপোর্ট' নজরুলের আরেকটি উল্লেখযোগ্য ব্যঙ্গ গান। এটিও তাঁর দেশপ্রেমের পরিচায়ক—

প্রথম ভাগ
ভারতে যাহা দেখিলেন
কোরাস
"কি দেখিতে এসে কি দেখিনু শেষে"
রিপোর্ট লেখেন সায়মন
হুটোপুটি করে ছুটোছুটি করে
বুড়ো বুড়ি, কাজে নাই মন
ম্যাদা দল আ উদো দল পায়ে
হস্ত বুলায় হর্দম
পুঁচকে দলের ফচকে ছোঁড়ারা
ছিটাইতেছে বটে কর্দম।

বৃটিশ শাসককে ব্যঙ্গ করে লেখা রাজনৈতিক ব্যঙ্গ গানে নজরুলের সাফল্য যে অতুলনীয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এখানে নজরুলের স্বদেশচেতনামূলক ব্যঙ্গ গানের তালিকা দেয়া হল।

১. এই বেলা নে ঘর ছেয়ে/এ দেশটা ভীষণ মূর্খ (প্রাথমিক শিক্ষা বিল)
২. একে একে সব মেরেছিস, জাতটা শুধু ছিল বাকি
৩. ঐ তেত্রিশ কোটি দেবতারে তোর (ভূত-ভাগানোর গান)
৪. কি দেখিতে এসে কি দেখিনু শেষে (সাইমন-কমিশনের রিপোর্ট)
৫. কে বলে, মোদের ল্যাডা গ্যাপকার (ল্যাবেন্ডিশ বাহিনীর বিজাতীয় সঙ্গীত)
৬. টিকি আর টুপিতে লেগেছে দ্বন্দ্ব বচন যুদ্ধ ঘোর
৭. তোমারই জেলে পালিছ ঠেলে (সুপার বন্দনা)
৮. থাকিতে চরণ মরণে কি ভয় (শ্রীচরণ ভরসা)
৯. দড়াদড়ির লাগবে গিঁঠ (রাউন্ডটেবিল কনফারেন্স)
১০. দাদা বলতো কিসের ভাবনা
১১. দ্যাখো হিন্দুস্থান সাহেব মেমের
১২. দে গরুর গা ধুইয়ে
১৩. ধ্বংশ কর এ কচুরি পানা

Dhaka University Institutional Repository

১৪. নখ-দন্ত বিহিন চাকুরি অধীন (বাঙালী বাবু)

১৫. নমঃ নমঃ রাম খটি

১৬. বগল বাঁজা দুলিয়ে মাজা (ডোমিনিয়ন স্টেটাস)

১৭. বসেছে শান্তি-বৈঠক বাঘ সিংহ হাঙ্গর (লীগ অব নেশন)

১৮. ভাই হয়ে ভাই চিনবি আবার

১৯. সাহেব কহেন চমৎকার (সাহেব ও মোসাহেব)। প্রভৃতি

## সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামমূলক গান

সবার উপরে মানবতাকে স্থান দিয়ে ছিলেন নজরুল। তাই ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ভেদ নয়, মানুষকে তিনি মানুষ হিশেবেই দেখতে চেয়েছেন— হিন্দু কিংবা মুসলিম নয়। আর এই মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে তৎকালীন ভারতের প্রধান দুই সম্প্রদায় হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কের অবনতি বিশেষ করে ১৯২৬ সালের দাঙ্গা তাঁকে গভীরভাবে আলোড়িত করেছিল। নজরুল অনুভব করেছিলেন একে তো বিদেশী শাসন তার ওপর ভাই-এ-ভাই-এ দ্বন্দ্ব যদি থাকে তাহলে ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে না; একই সঙ্গে ভারতের দূর্গতি ও দূর হবে না। এই বেদনাবোধে তাঁর দেশপ্রেমিক সত্তা কেদে উঠেছিল। কেননা তাঁর স্বপ্নছিল স্বাধীন দেশের মানুষের মৌলিক অধিকার আদায়ের স্বপ্ন। "সকল সম্প্রদায়ের মানুষ গভীর প্রীতির সঙ্গে সেখানে বসবাস করবেন, মানবিক মূল্যবোধের উচ্চ বিকাশ ঘটবে সেখানে, মানবতাবাদী কবির এই ছিল একান্ত কামনা। এই কামনা থেকেই হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির বিষয়টিকে নজরুল অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে বাঙালি কবি এ সঙ্গীত রচয়িতাদের মধ্যে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির আকুতি তাঁর রচনারই সর্বোচ্চ রূপ লাভ করে। হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির ধারা দুটিকে তিনি তাঁর সৃজনশীল প্রক্রিয়ায় মিলিয়ে নিয়েছিলেন এবং সেই মিলিত ধারাকে উচ্চত করে তুলেছিলেন নানা ধরণের রচনায়, বিশেষ করে কবিতায় ও গানে। আর কোন বাঙালি কবির মধ্যে এ ঘটনাটি এমনভাবে ঘটেনি" (করুণাময় গোস্বামী: ১৯৭৮: ১৫৪)।

নজরুল নিজেই বলেছেন 'হিন্দু-মুসলমানের পরস্পরের অশ্রদ্ধা দূর করতে না পারলে যে এ পোড়া দেশের কিছু হবে না। আমিও মানি' (ইব্রাহিম খাঁকে লেখা পত্র) ১৯৪১ সালে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির সভায় নজরুল যে শেষ অভিভাষণ দিয়েছিলেন সেখানে তিনি তাঁর সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের কথা বলেছেন স্পষ্ট করে— 'হিন্দু মুসলমানে দিনরাত হানাহানি, জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ, যুদ্ধ বিগ্রহ, মানুষের জীবনে একদিকে কঠোর দারিদ্র, ঋণ, অভাব অন্যদিকে লোভী অসুরের যক্ষের ব্যাংকে কোটি কোটি টাকা পাষাণ-স্তুপের মতো জমা হয়ে আছে— এই অসাম্য এই ভেদ জ্ঞান দূর করতেই আমি এসেছিলাম'।

*Dhaka University Institutional Repository*

এ জন্যই তিনি হিন্দু-মুসলিম সবাইকে আহ্বান জানিয়েছেন সত্য, ন্যায়, সুন্দর, মঙ্গল এবং পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের পথে। নজরুল সাম্প্রদায়িক-সম্প্রীতি ভাবনার মধ্য দিয়ে স্বদেশচেতনার পরিচয় দিয়েছেন।

মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম
হিন্দু-মুসলমান।
মুসলিম তার নয়নমণি,
হিন্দু তাহার প্রাণ ॥

এটি নজরুলের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং দেশপ্রেমমূলক একটি অসাধারণ গান। এ গানের মধ্যে ভারতের এই দুই সম্প্রদায়ের আত্মার আত্মীয় এবং তারা একই মায়ের সন্তান এই বাণী শব্দ ও ভাষাশৈলীর অপূর্ব নিপুণতায় ফুটে উঠেছে। গানের শেষ চরণে এদের সম্প্রীতির মধ্যদিয়ে ভারত পৃথিবীর বুকে অহংকার দীপ্ত পদচারণা যে করতে পারবে সে প্রত্যাশা ব্যক্ত করা হয়েছে। বাণীর সঙ্গে গানটির সুর এক অপূর্ব সমন্বয় সাধন করে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে—

কাঁদবো তখন গলা ধরে
চাইবো ক্ষমা পরস্পরে
হাস্‌বে সেদিন গরব ভরে এই হিন্দুস্থান ॥

নজরুলের আরও একটি গান 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু' আপাত ভাবে পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রামমূলক গান হলেও এটি যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিমূলক গান (কল্পতরু সেনগুপ্ত; ১৯৯২: ১৬৫) তা গানের উৎস এবং চরণ-ই বলে দেয়। কবি লিখেছেন—

হিন্দু না ওরা মুসলিম— এই জিজ্ঞাসে কোন জন
কান্ডারী বল, ডুবিছে মানুষ সন্তান মোর মার

এই গানটি রচনার ইতিহাস সন্ধান করলে আমরা দেখবো ১৯২৬ সালের এপ্রিলে কলকাতায় যখন হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা হয় তখন নজরুল কৃষ্ণনগরে ছিলেন এবং এই খবরে তিনি বিচলিত হয়ে পড়েন। পরের মাসে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক কংগ্রেসের বার্ষিক যে সম্মেলন হয় সেখানে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতিকে গুরুত্ব দিয়ে উদ্বোধনী সংগীত হিশেবে এই গানটি (দুর্গম গিরি) পরিবেশন করেন ॥ এ ভাবে নজরুল তাঁর এই ধারার গানগুলিতে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-বিভেদ ভুলে গিয়ে হিন্দু-মুসলিম সবাইকে উদ্দীপ্ত করায় চেষ্টা করেছেন তারা ভারতবাসী— একই মায়ের সন্তান। তাঁর পূর্বে বা সমকালে আর কেউ এখানে নজরুলের সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামমূলক গানের তালিকা দেয়া হল।

১. জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত জালিয়াৎ খেলছে জুয়া
২. দুর্গম গীরি কান্তার মরু

*Dhaka University Institutional Repository*

৩. ধর্মের পথে শহীদ যাহারা আমরা সেই সে জাতি
৪. পুঁথির বিধান যাক পুড়ে তোর / বিধির বিধান সত্য হোক
৫. ভাইয়ের দোরে ভাই কেঁদে যায় তুলে নে না তারে কোলে
৬. ভারতের দুই নয়ন-তারা হিন্দু-মুসলমান
৭. মানবতাহীন ভারত শশ্মানে দাও মানবতা, হে পরমেশ
৮. মুসলিম আর হিন্দু মোরা দুই সহোদর ভাই
৯. মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান
১০.শিকলে যাদের উঠিছে বাজিয়া বীরের মুক্তি তরবারি
১১.সঙ্ঘশরণ তীর্থ-যাত্রা-পথে এসো মোরা যাই
১২.হিন্দু-মুসলিম দুটী ভাই / ভারতের দুই আঁখি-তারা

## নিঃসর্গ বন্দনামূলক গান

নজরুলের সাহিত্য ও সঙ্গীতে দেশপ্রেম নানা ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে নিঃসর্গ বন্দনার মাধ্যমে স্বদেশচেতনার যে পরিচয় তা এখানে আলোচনা করা হল। দেশবন্দনামূলক গানের মধ্যে এগুলো সম্পৃক্ত না করে আমরা পৃথকভাবে আলোচনা করছি। নজরুলের পূর্বে এই ধারার সবচেয়ে সফল সঙ্গীতকার নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথ। তাঁর গানে বাংলার প্রকৃতির যে স্নিগ্ধ রূপ ধরা পড়ে অন্য কারো গানে এমনটি আর পাই না আমরা —

আকাশ ভরা সূর্যতারা বিশ্বভরা প্রাণ
তাহারই মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান। .....

তবে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি বন্দনার প্রধান অংশ-ই বর্ষাকে নিয়ে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নিঃসর্গ বন্দনায় নজরুলের যে পার্থক্য তা হচ্ছে কবিগুরু প্রকৃতিকে অনুভূতির সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছেন অর্থাৎ ব্যক্তিকেন্দ্রিক। কিন্তু নজরুলের প্রকৃতি কবি হৃদয়ের বাইরে দেশকেন্দ্রিক এবং সার্বজনীন। এ জন্যই এখানে দেশচেতনা অনুরণিত। যেমন —

আমার শ্যামলা বরণ বাংলা মায়ের
রূপ দেখে যা, আয়রে আয়
গিরি-দরী-বনে-মাঠে-প্রান্তরে রূপ ছাপিয়ে যায় ॥
ধানের ক্ষেতে বনের ফাঁকে
দেখে যা মোর কালো মা'কে
ধূলি-রাঙা পথের বাঁকে বৈরাগিনী বীণ্ বাজায় ॥

Dhaka University Institutional Repository

এখানে একদিকে যেমন বাংলায় চিরন্তন নিঃসর্গ সৌন্দর্য অংকিত হয়েছে, তেমনি কবি এখানে বাংলা মায়ের অপরূপ রূপ দেখার আমন্ত্রণও জানিয়েছেন। মায়ের প্রতি কবির ভালবাসার অভিব্যক্তি এভাবে ফুটে উঠেছে গানটিতে। এ ধরণের অসাধারণ দেশাত্মবোধক গান বাংলা ভাষায় খুব কম-ই আছে। নজরুলের এই ধারার আরও কিছু গান নিম্নরূপ— 'এ কি অপরূপ রূপে মা তোমায়' (এটি একই সঙ্গে দেশবন্দনার গানও); 'জননী মোর জন্মভূমি, তোমার পায়ে নোয়াই মাথা', 'বাংলা মা তোর সোনার ক্ষেতে দেখা যায় কার আচলখানি', 'সোনার আলোয় ঢেউ খেলে যায় মাঠের ঘাসে ঘাসে' প্রভৃতি। নিঃসর্গ বন্দনামূলক গানের মধ্যে ঋতুর গানগুলোও পড়ে। নজরুলের এই ধারার গান একেবারে কম নয়। কিছু কিছু ঋতুর গানে দেশ তথা দেশের মানুষের কষ্টের কথা আছে। যেমন বর্ষার দুটি গান— 'ঝরে বারি গগণে ঝুরু ঝুরু' এবং 'ঝরিছে অঝোর বর্ষার বাণী'। ঋতু বিষয়ক গানের সঙ্গে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কবি হৃদয়ের গীতিময়তা সম্পর্কিত হলেও কিছু কিছু গানে আমরা ভিন্নতা পাই। যেমন শরতের 'এস শারদ প্রাতের পথিক' গানটি— কবি লিখেছেন—

শ্যাম শস্যে কুসুমে হাসিয়া
এস হিমেল হাওয়ায় ভাসিয়া
এস ধরণীরে ভালবাসিয়া।

আবার শিল্পীর তুলির ছোয়ায় জল রঙে আঁকা ছবির মতো ধরা পড়ে হেমন্তে বাংলার অসাধারণ রূপ—

সবুজ শোভার ঢেউ খেলে যায়
ঢেউ খেলে যায় নবীন আমন ধানের ক্ষেতে।
হেমন্তের ঐ শিশির-নাওয়া হিমেল হাওয়া
সেই নাচনে উঠলো মেতে ॥

এভাবেই নজরুল তাঁর নিঃসর্গ বন্দনামূলক গানে দেশ-মাতৃকাকে তুলে ধরতে চেয়েছেন অকৃত্রিম অনুরাগে।

## আত্মশক্তি ও উদ্দীপনামূলক গান

মাসিক পত্রে নজরুলের বিদ্রোহী কবিতা পড়ে বুদ্ধদেব বসু বলেছিলেন— 'অসহযোগ অগ্নিদীক্ষার পরে সমস্ত মন প্রাণ যা কামনা করেছিল এ যেন তাই। দেশব্যাপী উদ্দীপনার এই যেন বাণী'। নজরুল বিদ্রোহী কবি হিশেবে খ্যাত হলেও তাঁর সাহিত্যে এবং গানের এক বড় এলাকা জুড়ে ভারতবর্ষের মানুষকে আত্মশক্তিতে বলিয়ান ও উদ্দীপ্ত করার চেতনা যেন ছড়িয়ে আছে। এই শ্রেণীর গানের মধ্যে আমরা লক্ষ করি ভারতের অতীত গৌরব, বীরত্ব এবং বীর সন্তানদেরকে স্মরণ করে পরাধীন ভারতবাসীকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা

*Dhaka University Institutional Repository*

আছে। এ রকমই একটি গান 'আশু-প্রয়াণ গীতি'। নজরুল গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন, স্বদেশী আন্দোলন, বিপ্লবী কর্মকাণ্ড, সাম্যবাদী আন্দোলন, প্রভৃতি বিষয়ে জনগণকে উদ্দীপ্ত করতে অসংখ্য গান রচনা করেছেন, পরাধীন ভারতের শোষিত জনগণকে আত্মশক্তি ফিরে পেতে নজরুল যে প্রেরণামূলক গান রচনা করেছেন তার সঙ্গে অন্য কারো তুলনা চলে না। "সকল দেশেই সঙ্গীত চিরদিন গণজাগরণ ও শৃঙ্খল মোচনের প্রেরণা দিয়েছে। মুক্তি সংগ্রামে উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে। ফরাসি বিপ্লব, নভেম্বর বিপ্লব, চীন বিপ্লব, স্পেনে গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রাম, কিউবায় বিপ্লব ও ল্যাটিন আমেরিকায় গণ মুক্তিযুদ্ধ . . . ইত্যাদিতে সঙ্গীতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দেখা গেছে। আমাদের দেশের বহু অনামী গীতিকারের লোকগীতি বৃটিশের বিরুদ্ধে গণবিদ্রোহের ও অমর শহীদদের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে— যেমন ক্ষুদিরামের ফাঁসির গান। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রঙ্গলাল, রজনীকান্ত প্রমুখের স্বদেশী গান দেশবাসীকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছে। কাজী নজরুল ইসলাম এই স্বদেশী এবং উদ্দীপক সঙ্গীত ধারায় আর একটি মাত্রা যোগ করেছেন। যা এদেশে সম্পূর্ণ নতুন" (কল্পতরু সেনগুপ্ত; ১৯৯২; ৭৫)।

পরাধীনতা কিংবা শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামমূলক গান তো বটেই, দেশবাসীর জন্য আত্মশক্তি ও উদ্দীপনামূলক গান রচনা করেছেন নজরুল। তাঁর এই ধারার একটি উল্লেখযোগ্য গান—

আমি বিধির বিধান ভাঙ্গিয়াছি, আমি এমনই শক্তিমান
মম চরণ তলে, মরণের মার খেয়ে, মরে ভগবান !

এখানে ভারতবাসীকে তার আত্মশক্তি সম্পর্কে সচেতন করে নিয়তি বা ভগবান রূপ বিদেশী শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধের উদ্দীপনা সংক্রামিত করেছেন। নজরুলের আত্মশক্তি ও উদ্দীপনামূলক সেরা গানটি হচ্ছে—

মোরা ঝঞ্ঝার মতো উদ্দাম, মোরা ঝর্ণার মতো চঞ্চল।
মোরা বিধাতার মতো নির্ভয়, মোরা প্রকৃতির মতো সচ্ছল ॥

"বাংলা সঙ্গীত জগতে ও জাতীয় জীবনে কাজী নজরুলের আর একটি বরণীয় ও স্মরণীয় অবদান হল তাঁর রচিত প্রগতিধর্মী ও উদ্দীপনার গানগুলি। তাঁর এই গানগুলি স্বদেশী সংগীত ও জাতীয়তাবাদী সংগীত রূপেও আখ্যাত হয়" (নীহারবিন্দু চৌধুরী; কাজী নজরুল ইসলাম : জন্মশতবর্ষ স্মারক গ্রন্থ; ২০০০; ৪৯৯)

এই ধারার প্রধান গানগুলোর তালিকা নিম্নে দেয়া হল—

১. আমাদের জমির মাটি ঘরের বেটি / সমান রে ভাই
২. আমি বিধির বিধান ভাঙ্গিয়াছি আমি এমন শক্তিমান
৩. আসে রে ঐ ভারত আকাশে / আশা অরুণ রবি

Dhaka University Institutional Repository

৪. এসো বিদ্রোহী মিথ্যা-সুদন আত্মশক্তি-বুদ্ধ বীর।
৫. এসো যুগ-সারথি নিঃশঙ্ক নির্ভয় / এস-চির-সুন্দর
৬. এসো অষ্টমী পূর্ণচন্দ্র- এসো পূর্ণিমা পূর্ণচাঁদ
৭. ওরে আজ ভারতের নব যাত্রা পথের
৮. কারা পাষাণ ভেদি জাগো নারায়ণ !
৯. জাগো দুস্তর পথের নব যাত্রী / জাগো জাগো
১০. "দেশ প্রিয় নাই" শুনি ক্রন্দন সহসা প্রভাতে জাগি
১১. নবীন আশা জাগলোরে আজ
১২. নাহি ভয় নাহি ভয় / দুঃখ সাগর মন্থন শেষ
১৩. পদ্মা-মেঘনা-বুড়ি গঙ্গা-বিধৌত পূর্ব দিগন্তে
১৪. বিশাল-ভারত-চিত্ত-রঞ্জন হে দেশ বন্ধু এসো ফিরে।
১৫. ভারত আজিও ভোলেনি বিরাট মহাভারতের ধ্যান।
১৬. মৃতের দেশে নেমে এল মাতৃ নামের গঙ্গাধারা
১৭. মোরা মায়ের পেটে ভূত ভাগাবো, মন্ত্র দিয়ে নয়।
১৮. হে পার্থ সারথি বাজাও বাজাও পাঞ্চ জন্য শঙ্খ। প্রভৃতি

## তরুণ-যুবা-ছাত্রদলের গান

নজরুল তারুণ্যের কবি। তরুণ-ছাত্রদলকে উৎসাহিত করা তাঁর সাহিত্য ও সঙ্গীতের প্রধান উদ্দেশ্য। 'তরুণের সাধনা' অভিভাষণে তিনি বলেছেন —

> আমার একমাত্র সম্বল, আপনাদের — তরুণদের প্রতি আমার অপরিসীম ভালবাসা, প্রাণের টান, তারুণ্যকে, যৌবনকে — আমি যেদিন হইতে গান গাহিতে শিখিয়াছি; সেই দিন হইতে বারে বারে সালাম করিয়াছি, তাজিম করিয়াছি ও সশ্রদ্ধ নমস্কার নিবেদন করিয়াছি। গানে কবিতায় আমার সকল শক্তি দিয়া তাহারই জয় ঘোষণা করিয়াছি, স্তব রচনা করিয়াছি।

নজরুলের 'ছাত্রদলের গান', 'চল্ চল্ চল্' এবং 'তরুণের গান'-এ এই প্রতিশ্রুতির প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। তরুণরা যে দেশের শক্তি ও সাহসের প্রতীক তাই যেন ফুটে ওঠে বার বার —

যে দুর্দিনে নেমেছে বাদল তাহারি বজ্র শিরে ধরি
ঝড়ের বন্ধু আঁধার নিশীথে ভাসায়েছি মোরা ভাঙ্গাতরী ॥
মোদের পথের ইঙ্গিত ঝলে বাঁকা বিদ্যুতে কালো মেঘে,
মরুপথে জাগে নব অঙ্কুর মোদের চলার ছোঁয়া লেগে,

Dhaka University Institutional Repository

মোদের মন্ত্রে গোরস্থানের আঁধারে ওঠে গো প্রাণ জেগে,
দীপ-শলাকার মতো মোরা ফিরি ঘরে ঘরে আলো সঞ্চরী ॥

(তরুণের গান)

কিংবা

ঊষার দুয়ারে হানি আঘাত
আমরা আনিব রাঙ্গা প্রভাত
আমারা টুটিব তিমির রাত
বাধার বিন্দাচল ॥

(চল্ চল্ চল্)

এই মার্চের গানটি প্রথম কোথায় কবে গাওয়া হয়েছিল এ নিয়ে বিতর্ক থাকলেও (দ্র. মজফফর আহমদ: স্মৃতিকথা) গানে তারুণের উদ্দীপনা ও শক্তির কথা নিয়ে বিতর্ক নেই। 'ছাত্র দলের গান' রূপে আখ্যায়িত 'আমরা শক্তি আমরা বল / আমরা ছাত্র দল' গানটির প্রসঙ্গেও একই কথা প্রযোজ্য। তবে এটি ১৯২৬ সালে কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত ছাত্র সম্মেলনের উদ্বোধনী গান হিশেবে নজরুল নিজেই পরিবেশন করেন।

এই ধারার উল্লেখযোগ্য গানের মধ্যে রয়েছে—

১. অগ্রপথিক হে সেনা দল
২. আমরা শক্তি আমরা বল
৩. আমি গাই তারই গান
৪. চলরে চপল তরুণ দল
৫. জগতে আজিকে যারা আগে চলে
৬. জাগোরে তরুণ দল
৭. দে দোল দে দোল
৮. নতুন পথের যাত্রা পথিক / চালাও অভিযান
৯. রাঙাপথের ভাঙন-ব্রতী অগ্রপথিক দল

## কোরাস ও মার্চের গানে দেশাত্মবোধ

নজরুলের বৈচিত্রময় দেশাত্মবোধ গানের ধারায় কোরাস ও মার্চের গান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই ধারার গানের আঙ্গিক ভিন্নতা-তো রয়েছেই সেই সঙ্গে বাংলায় মার্চের গান সফলভাবে রচনা করার প্রথম কৃতিত্ব যে নজরুলের তা বলার অপেক্ষা রাখে না। যদিও ডি এল রায় তাঁর পূর্বেই মার্চের গান রচনা করেছেন। এখানে বলে নেয়া ভাল মার্চের গান বলতে কোনো বিশেষ বিষয়কেন্দ্রিক গানকে বোঝানো হয় না। মার্চের গান এক ধরণের কোরাস বা সম্মিলিত কুচকাওয়াজের গান। তরুণ-ছাত্রদলের উদ্দেশ্যে রচিত

*Dhaka University Institutional Repository*

নজরুলের কিছু গান তাই মার্চের গানের অন্তর্ভুক্ত। "নজরুল যে সব কোরাস গান রচনা করেছিলেন তা সুরের দিক থেকে দু-ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন- মার্চের সুরে রচিত কিছু গান যার মধ্যে কুচকাওয়াজের গান, নারী জাগরণের গান, ছাত্র দলের গান, সৈন্য দলের গান। আরেক ধরণের কোরাস গান তিনি রচনা করেছিলেন যা পুরোপুরি জাতীয়তাবাদী — বিদেশী অপশাসনের বিরুদ্ধে" (বুদ্ধদেব রায়; ১৯৯০; ৫০)। নজরুলের পূর্বেও বাংলায় কোরাস গান ছিল। মূলত স্বদেশী আন্দোলনের যুগে এই ধারার জন্ম। সেদিন দেশবাসীকে জাতীয়চেতনায় উদ্দীপ্ত করতে সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্র ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, ডি এল রায়, অতুলপ্রসাদ প্রমুখ গান রচনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথও বাউল ও কীর্তন ভাঙ্গা সুরে কোরাস গান লিখেছেন। সৈনিক-কবি নজরুল শুধু কোরাস গান-ই লেখেননি। সৈনিক-তরুণ দলের মার্চ-পাস্টের তালে তালে সুর মিলিয়ে রচনা করেছেন কোরাস-মার্চের গান। এই গানগুলিতে তারুণ্যের উদ্দীপনা ও প্রাণচাঞ্চল্যতো বটে সেই সঙ্গে স্বদেশ চেতনার পরিচয় বিধৃত হয়েছে। 'তাঁর কোরাস গানগুলি বাস্তবিক-ই স্বদেশিকতা ও সংগ্রামী ভাবের উদ্বোধক' (নীহারবিন্দু চৌধুরী; পূর্বোক্ত)। কোরাসের-ই স্বগোত্র মার্চের গানের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য —

চল্ চল্ চল্। চল্ চল্ চল্।
ঊর্ধ্বে গগণে বাজে মাদল
নিম্নে উতলা ধরণীতল
অরুণ প্রাতের তরুণ দল
চল্ রে চল্ রে চল্
চল্ চল্ চল্

মার্চের আরও একটি উল্লেখযোগ্য গান —

বীর দল আগে চল
কাপাইয়া পদভারে ধরণী টলমল
যৌবন সুন্দর চির-চঞ্চল ॥

নজরুলের কোরাস গানের মধ্যে অন্যতম একটি রচিত হয়েছিল ১৯২১ সালে কুমিল্লায় ইংল্যান্ডের যুবরাজের আগমন উপলক্ষে যে হরতাল হয় — তার শোভাযাত্রায়

কোরাস : ভিক্ষা দাও ভিক্ষা দাও
ফিরে চাও ওগো পুরবাসী / সন্তান দ্বারে উপবাসী,
দাও মানবতা ভিক্ষা দাও / জাগো গো জাগো গো,

নজরুলের কোরাস গানের সংখ্যা তেমন বেশি নয়। ইতোমধ্যেই আমরা এগুলোর কিছু বিভিন্ন ধারার মধ্যে আলোচনা করেছি। লক্ষ করার বিষয় যে এই গানগুলো দুটি সুরের ধারায় বিভক্ত। একটি বিদেশী (ইংল্যান্ড) সুরের কাঠামো (মার্চ) অন্যটি রাগ সঙ্গীতের

Dhaka University Institutional Repository

কাঠামোতে সুরারোপিত। প্রথমটির উদাহরণ 'আমরা শক্তি আমরা বল', দ্বিতীয়টির উদাহরণ— 'মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম'। সংখ্যায় কম হলেও নজরুলের কোরাস গানগুলি অনবদ্য নিঃসন্দেহে। 'কোরাস গানগুলির মধ্যে আমরা কবির স্বাদেশিকতা ও সংগ্রামী ভাবের দ্যোতনা দেখতে পাই। কবির মার্চের গানগুলি (March Songs) অর্থাৎ যুদ্ধ যাত্রার গানগুলির মধ্যে আমরা লক্ষ করি বীর রসের প্রাবল্য। তাঁর এই পর্যায়ের গানগুলি সংগ্রামশীলতার দ্যোতক ও দেশপ্রেমবোধক'। (ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র; কাজী নজরুল ইসলাম: জন্মশতবর্ষ স্মারক গ্রন্থ: ২০০০: ৪৮৩)

## জাতীয়উন্নতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কমূলক গান

পরাধীন ভারতবর্ষকে শুধু শৃঙ্খলমুক্ত করার বাসনা-ই ব্যক্ত করেননি নজরুল। তিনি একই সঙ্গে অভাগা ভারতের জাতীয় উন্নতিতে অবদান রাখতে অনুপ্রাণীত করেছেন। তাঁর গানে-সাহিত্যে নানা ভাবে সেই প্রেরণা ব্যক্ত হয়েছে। তবে জাতীয়উন্নতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কমূলক দেশপ্রেমের গানের সংখ্যা হাতে গোনা দু-একটি। এরই মধ্যে শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম মূলক গানে আমরা ধীবরদের গান-এর কথা উল্লেখ করেছি। সেখানে জেলেদের উদ্দেশ্য করে কবি যা বললেন তাতে জাতীয় উন্নয়নের-ই ইংগিত করেছেন তিনি—

আমরা নীচে পড়ে রইব না আর
শোনরে ও ভাই জেলে এবার উঠবো রে সব ঠেলে ॥

আরেকটি গানে স্বদেশমাতার ভিখারিণী বেশ কবিকে ব্যথিত করে তুলেছে তাই তিনি চান মা'তার বিশ্বমাঝে মাথা উঁচু করে দাঁড়াক—

এস মা ভারত-জননী আবার / জগৎ তারিণী সাজে
রাজরাণী মা'র ভিখারিনী বেশ / দেখে প্রাণে বড় বাজে ॥

বিশ্ব যখন সভ্যতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে দ্রুত; ভারত তখন পিছিয়ে পড়ছে, অথচ ভারতের রয়েছে অতীত গৌরব ইতিহাস। কেন তাঁর প্রিয় মাতৃভূমির এই পতন কবি তা জানতেন। তাই এগিয়ে চলার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন তিনি আশার-আলোর আহ্বানে—

দুঃখ কি ভাই হারানো সুদিন ভারতে আবার আসিবে ফিরে
দলিত শুষ্ক এ মরুভূ পুনঃ হয়ে গুলিস্তাঁ হাসিবে ধীরে ॥

আমরা আন্তর্জাতিক মৈত্রী ও সম্পর্কমূলক অন্তত একটি গান পেয়েছি নজরুলের। এখানেও স্বদেশচেতনা আভাসিত। গানটি ১৯৪২ সালে ৯ ফেব্রুয়ারি চীনের নেতা চিয়াং কাইশেক ও তাঁর স্ত্রীর ভারত সফর উপলক্ষে কবি নজরুল রচনা করেন। নজরুলের দেশাত্মবোধক গানের ধারায় এটি একটি ব্যতিক্রমী সন্দেহ নেই—

*Dhaka University Institutional Repository*

চীন ও ভারতে মিলেছি আবার মোরা শত কোটি লোক।
চীন ভারতের জয় হোক। ঐক্যের জয় হোক। সাম্যের জয় হোক।
ধরার অর্ধ নর-নারী মোরা রহি এই দুই দেশে,
কেন আমাদের এতো দুর্ভোগ নিত্য দৈন্য ক্লেশে।
সহিব না আর এই অবিচার খুলিয়াছি আজি চোখ ॥

## দেশাত্মবোধক গানের বাণী ও সুর প্রসঙ্গ

বাণী ও সুরের অপূর্ব সমন্বয়ে নজরুলের স্বদেশ চেতনামূলক গানগুলি যে জনপ্রিয় তা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। দেশাত্মবোধক গানে দেশ-ই প্রধান তাই সুরের আলোচনা এ অভিসন্দর্ভের লক্ষ্য নয়। তবু কিছু গানে নজরুল যে সুরের বৈচিত্র্য ও মিশ্রণ ঘটিয়েছেন সে বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনায় যাবার পূর্বে নজরুলের কয়েকটি শ্যামাকীর্তন এবং ছাদ পেটানোর গানের বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। কেননা এই গানগুলোতেও দেশাত্মবোধের পরিচয় রয়েছে।

নজরুলের দুটি রাগপ্রধান শ্যামাগীতি হচ্ছে—

১. শ্মশানে জাগিয়ে শ্যামা মা
অন্তিমে সন্তানে নিতে কোলে
জননী শান্তিময়ী বসিয়া আছে
ঐ চিতার আগুন ঢেকে স্নেহ আঁচলে ॥

২. ভগবান শিব জাগো জাগো, ছাড়িয়া গেছেন দেবী শিবানী সতী।
শক্তিহীন আজি সৃষ্টি চন্দ্র-সূর্য-তারা হীন জ্যোতি ॥
হে শিব, সতীহারা হ'য়ে নিষ্প্রাণ / ভূ-ভারত হইয়াছে শবের শ্মশান।

প্রথমটির রাগ কৌশীকী দ্বিতীয় গানটির আশা-ভৈরবী। শ্যামাগীতি বা ভক্তিগীতি হওয়া সত্ত্বেও এ দুটি গানের মধ্যে বিশেষ করে বাণীতে দেশপ্রেম প্রকাশিত হয়েছে। 'আমার মায়ের চেয়ে শান্তিময়ী' গানটিও এক্ষেত্রে বিবেচিত হতে পারে। অর্থাৎ নজরুলের দেশাত্মবোধক গানে তো বটেই এর বাইরেও অনেক গানে আমরা তাঁর স্বদেশচেতনার পরিচয় পাই। নজরুলের লোকগীতিধর্মী আরেক'টি গান— 'সারাদিন পিটি কার দালানের ছাঁদ গো'— শ্রমিকদের ছাদ পেটানোর এই গানটিতেও দেশ ভাবনার স্বাক্ষর রয়েছে। দেশের দুরাবস্থায় ক্ষোভ বা হতাশার প্রকাশও তাঁর কিছু কিছু গানে আমরা লক্ষ করি। যেমন— 'ভোল লাজ ভোল গ্লানি জননী ..... কবে যে ঘুমালি মরণ ঘুমে মা; সেই আমাদের বাংলাদেশ! রাজরাণী আজ ভিখারিনী' প্রভৃতি। সম্ভবত বাংলায় আর কোনো কবি এতো বৈচিত্র্য এবং বিপুল সংখ্যক দেশাত্মবোধক গান রচনা করেননি। গবেষক করুণাময়

*Dhaka University Institutional Repository*

গোস্বামী নজরুলের দেশাত্মবোধক গানের আরেকটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন তা হচ্ছে— গানগুলো বেশ দীর্ঘ। যেহেতু সভা সমিতি-মিছিলের জন্যে অনেক গান রচিত হয়েছিল তাই জনগণকে উদ্দীপ্ত করতে এগুলোর আয়েতন বৃদ্ধি পেয়েছে। নজরুলের প্রধান প্রধান দেশাত্মবোধক গান মূলত সাহিত্য চর্চার প্রথম দিকে রচিত। যৌবনদীপ্ত বিদ্রোহী কবি নজরুলের হাতে তাঁর সংগ্রামী জীবনেই রচিত হয়েছে এই গানগুলো। আর এ সময়ে রচিত অধিকাংশ গান-ই যে বীর-রসাত্মক তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে 'এ কি অপরূপ' জাতীয় শান্ত রসের গানও দুর্লভ নয়। অর্থাৎ দুই প্রান্তের দুই রস এবং সুরের সম্মোহনী শক্তি দিয়ে নজরুল তাঁর বৈচিত্র্যময় দেশাত্মবোধক গান সৃষ্টি করেছেন। তাছাড়া "নজরুল দেশবন্দনামূলক গানে দেশ বোঝাতে যখন বঙ্গদেশের কথা বলেছেন তখন তাঁর গানের বাণী ও সুরের গড়ন যেমন, দেশ বোঝাতে যখন ভারত বা ভারতবর্ষকে বুঝিয়েছেন তখন তাঁর গানের বাণী ও সুরের গড়ন তেমন নয়। বঙ্গদেশ বোঝাতে তাঁর যে সঙ্গীত রচনা তাতে আবহমান লোকসঙ্গীতের একটা আবহ পাওয়া যায়, কি রাগ বিন্যাসে কি সুর বিন্যাসে। এই নদীমাতৃক, গ্রামকেন্দ্রিক দেশের শোভার অন্তরঙ্গ পরিচয় তুলে ধরতে তিনি এখানকার আবহমান জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত আবহমান সংগীতকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। নমঃ নমঃ নমো বাংলাদেশ মম, আমার শ্যামলা বরণ বাংলা মায়ের... প্রভৃতি... কিন্তু গানটি যখনই- উদার ভারত সকল মানবে; গঙ্গা, সিন্ধু নর্মদা কাবেরী যমুনা ওই/ বহিয়া চলেছে আগের মতন / কইরে আগের মানুষ কই ॥ তখন তার বাণীর মেজাজের মত সুরের মেজাজও পাল্টে যায়" (করুণাময় গোস্বামী; ১৯৭৮; ৪০৯)। অর্থাৎ সমালোচক করুণাময় গোস্বামী আমাদের জানাচ্ছেন যে নজরুলের বিভিন্ন ধারার দেশাত্মবোধ গানের মধ্যেও 'আভ্যন্তর বৈচিত্র্য আছে, বাণীতেও আছে, সুরেও আছে'। আসলে নজরুলের স্বদেশচেতনামূলক গানের প্রধান দিকটি হচ্ছে বাণী— সাঙ্গীতিক রূপায়ণ নয়। এই বাণীর সঙ্গে সম্পৃক্ত করে বা এই বাণীকে সুর ও ছন্দে বাহনে শ্রোতার কান থেকে হৃদয়ে পৌঁছে দেয়াটা-ই আসল। শ্রোতার কানে প্রথমে যায় গানের সুর এরপর বাণী। ভাষিক বিশ্লেষণে নজরুলের দেশাত্মবোধক গানের শব্দ-ধ্বনিতাত্ত্বিক নান্দনিক মাধুর্য যেমন আছে (ধরা যাক— 'আজ রক্তনিশি ভোরে / একি এ শুনি ওরে' কিংবা 'আমার শ্যামলা বরণ বাংলা মায়ের' গান দুটিতে সুরের সঙ্গে ধ্বনির এক অনুপ্রাসধর্মীতা শ্রোতাকে স্পর্শ করে) তেমনি আছে হৃদয়-স্পর্শী কথা বা বাণী। একথা মানতেই হয় বাণী এবং সুরের সমন্বয়ই যে-কেনো গানের সাফল্যের প্রধান কারণ। তাই বাণী প্রধান হওয়া সত্ত্বেও সুরের যে একটি ভূমিকা বা আবেদন রয়েছে নজরুলের একটি দেশাত্মবোধক গানের সুর বিশ্লেষণ করলে তা স্পষ্ট হবে।

*Dhaka University Institutional Repository*

'একি অপরূপ রূপে মা তোমায় হেরিনু পল্লী-জননী।
ফুলে ও ফসলে কাঁদা-মাটী জলে ঝলমল করে লাবণী ॥

গানটি মূলত 'বেহাগ-মিশ্র' রাগের। এই গানটির শেষ দিকে একটি চরণ রয়েছে— 'ভাটিয়ালী গাও মাঝিদের সাথে। কীর্তন শোনো রাতে মা'। এই কীর্তনের এখানে এসে লোকগীতির মধ্যে যোগ হয়েছে কীর্তনের সুর (রাতে মা-আ-আ-আ-আ....)। এর ফলে গানটি অনেক বেশি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। প্রয়োজনে কোথাও কোথাও তিনি মিশ্র সুর বা বিদেশী সুরেরও সমাবেশ ঘটিয়েছেন। স্বদেশী গানে রাগ মিশ্রণ নজরুলের পূর্বে রবীন্দ্রনাথও করেছেন। যেমন 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে'— এখানে বাউল-কীর্তনের সঙ্গে ভৈরবীর মিশ্রণ হয়েছে। তবে রাগ মিশ্রণের মাধ্যমে বৈচিত্র্য সৃষ্টির প্রয়াস নজরুলে অনেক বেশি। তাছাড়া, "রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল বা মুকুন্দ দাসের স্বদেশাত্মক গানে দেশপ্রেমের অপূর্ব অভিব্যক্তি ঘটেছে ঠিক-ই কিন্তু এসব গানে তরুণ দলকে উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত করার মতো সুর-ঝংকারের বড় অভাব ছিল— এই শ্রেণীর গানের ছন্দ ও সুরে নজরুল এক অসাধারণ বীর্যবত্তার প্রবর্তন করলেন। ফলে গানগুলি হয়ে উঠলো অনলবর্ষী এবং পৌরুষব্যঞ্জক। 'কারার ঐ লৌহ কপাট ভেঙ্গে ফেল কররে লোপাট' গানটির কথা স্মরণ করুন— ইমন ও বিলাবলের আমেজে ভরা এক তালায় নিবদ্ধ এই গানটি গাওয়ার সময় কী অপূর্ব ভাবোন্মদনার না সৃষ্টি হয়! 'এই শিকল পরা ছল মোদের এই শিকল পরা ছল' কিংবা 'তোরা সব জয়ধ্বনি কর' এ গান দুটিও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। শেষোক্ত গানটির সুর রচনায় অনেক গুলো সুরের সংমিশ্রণ ঘটেছে— যেমন মালকোষ-ভৈরব-মেঘ-বসন্ত-হিন্দোল-নটনারায়ণ-রাগ-রাগিনীর ভাঙ্গা গড়ায় নতুন সুর সৃষ্টিকে নজরুল যে কী পরিমান পারদর্শী ছিলেন এটি তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত" (আবদুল আজীজ আল-আমান (সম্পাদিত); ১৯৭৮; ৩৪) এভাবে নজরুল তাঁর দেশাত্মবোধক গানে বাণীর গুরুত্ব ধরে রেখেও সুরের যথার্থ এবং অবিকল্প প্রয়োগ করে বাংলা স্বদেশচেতনামূলক গানে আপন প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন।

## উপসংহার

মূলত বিদ্রোহী হিশেবে নজরুলের খ্যাতি হলেও বাংলা গানের ইতিহাসে এক মহান সংগীত-ব্যক্তিত্বও তিনি। নজরুল একাধারে গীতিকার, সুরকার, গায়ক, সুরস্রষ্ঠা, সঙ্গীত-পরিচালক এবং সঙ্গীত-শিক্ষকও। সুর ও বিষয় বৈচিত্র্যে তাঁর গানের সংখ্যা যেমন অনেক, তেমনি জনপ্রিয়। আর বাংলা গানে নজরুলের খ্যাতি ও পরিচিতি শুধু এ কারণেই নয়। পরাধীন ভারতবাসীকে তিনি জাগিয়ে তুলেছিলেন স্বদেশচেতনামূলক সঙ্গীত রচনার ম'ধ্যমে। তাই দেশাত্মবোধক গানের ধারায় নজরুল অপ্রতিদ্বন্দ্বী, কী সুরে কী বাণীতে। আমরা **নজরুল সঙ্গীতে স্বদেশচেতনার স্বরূপ** এই অভিসন্দর্ভে সেই প্রাচীন কাল থেকে

*Dhaka University Institutional Repository*

নজরুল পর্যন্ত বাংলা গানে দেশচেতনা, বিভিন্ন স্বদেশী আন্দোলন-ঘটনা প্রভৃতি আলোচনা করে এ কথা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, নজরুল তাঁর কালের যুগমানসকে ধারণ করে মাতৃভূমির প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসায় একটি সার্বভৌম স্বাধীন স্বদেশের স্বপ্নে উদ্দীপ্ত হয়ে, ভারতের অসহায় লাঞ্ছিত-বঞ্চিত মানবতার মুক্তির লক্ষ্যে জনগণকে উজ্জীবিত করতে রচনা করেছেন স্বদেশচেতনামূলক গান। তাঁর এই গানের বাণী ও সুরে তাই বাংলাদেশের কাদা-মাটি-জল ও মানুষের গন্ধ-স্বাদ লেগে আছে। দেশাত্মবোধক গানে এমন বিপ্লবীচেতনা এবং মাটি ও মানুষের প্রতি অপূর্ব মমতার সমন্বয় অন্ততঃ বাংলা ভাষায় আর কারো গানে ধ্বনিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই।

## গ্রন্থপঞ্জি


১. আবদুল আজীজ আল-আমান (সম্পাদিত)
১৯৭৮; নজরুল গীতি অখণ্ড; ফরফ প্রকাশনী (ষষ্ঠ সং-১৯৯১); কলকাতা

২. ওয়াকিল আহমেদ (সম্পাদনা)
২০০০; কাজী নজরুল ইসলাম : জন্মশতবর্ষ; বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি; ঢাকা

৩. ইদ্রিস আলী
১৯৯৭; নজরুল-সঙ্গীতের সুর : নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা

৪. করুণাময় গোস্বামী
১৯৯৩; বাংলা গানের বিবর্তন; বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
১৯৯০; বাংলা কাব্যগীতির ধারায় কাজী নজরুল ইসলামের স্থান; বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
১৯৭৮; নজরুলগীতি প্রসঙ্গ, প্রথম পুন:মুদ্রণ, ঢাকা

৫. কল্পতরু সেনগুপ্ত
২০০০; কাজী নজরুল ইসলাম : জন্মশতবর্ষ স্মারক গ্রন্থ; পশ্চিমবাংলা, বাংলা আকাদেমি, কলকাতা।
১৯৯৭ : নজরুল গীতি সহায়িকা (সম্পাদিত) : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সঙ্গীত আকাডেমি : কলকাতা
১৯৯২ ; জনগণের কবি কাজী নজরুল ইসলাম; পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ; কলকাতা

৬. জামরুল হাসান বেগ
১৯৯৮; নজরুল ইসলাম ও অন্যান্যরা : বাংলা একাডেমী; ঢাকা

৭. নারায়ণ চৌধুরী
১৯৯৩; কাজী নজরুলের গান; মুক্তধারা; ঢাকা
১৯৯১; বাংলা গানের জগত; ফার্মা কে এলএম প্রা: লি:, কলকাতা

৮. নীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায়
১৯৮৭; নজরুল-প্রভাকর; হসন্তিকা প্রকাশিকা; কলকাতা

৯. প্রভাতকুমার গোস্বামী (সম্পাদিত)
১৩৭৬; হাজার বছরের বাংলা গান; স্বারসত লাইব্রেরী; কলকাতা।

১০. বাঁধন সেনগুপ্ত
১৯৭৬; নজরুল কাব্যগীতি : বৈচিত্র্য ও মূল্যায়ন; নবজাতক প্রকাশনী; কলকাতা

*Dhaka University Institutional Repository*

১১. ব্রহ্মমোহন ঠাকুর

১৯৯৪: নজরুল সঙ্গীত কোষ: বাণী প্রকাশ: কলকাতা

১২. বুদ্ধদেব রায়

১৯৯০: বাংলা গানের স্বরূপ; ফার্মা কে এল এম প্রা: লি: কলকাতা

১৩. মুজাফ্‌ফর আহমেদ

১৯৬৫; কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা; মুক্তধারা (৩য় সং-১৯৮৭); ঢাকা

১৪. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম

১৯৮৩: সমকালের নজরুল ইসলাম: শিল্পকলা একাডেমী; ঢাকা

১৫. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (সম্পাদিত)

১৯৭২; নজরুল সমীক্ষা; ঢাকা

১৬. মৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্তী

১৯৯৫; বাংলা কীর্তন গান; সাহিত্যলোক; কলকাতা

১৭. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী

১৯৯৩: বাংলা গানের ধারা; শিল্পকলা একাডেমী; ঢাকা।

১৮. রফিকুল ইসলাম

১৯৭২; নজরুল জীবনী; বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ঢাকা

১৯. রাজিয়া সুলতানা

১৯৬৯; নজরুল অন্বেষা, মখদুমী এন্ড আহসানউল্লা লাইব্রেরী; ঢাকা।

২০. শান্তি সিংহ (সম্পাদিত)

১৯৮৮; স্বদেশ আমার; নিউ বেঙ্গল প্রেস; কলকাতা

২১. শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

১৯৯৫; কেউ ভোলে না কেউ তোলে; নিউ এজ; কলকাতা

২২. সফিকুন্নবী সামাদী

২০০১; নজরুলের গান: কবিতার স্বাদ; জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশ: ঢাকা।

২৩. সীমা বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৮৬; রবীন্দ্রসংগীতে স্বদেশচেতনা; গণমন প্রকাশনী; কলকাতা

২৪. সুকুমার রায়

১৩৭৬; বাংলা সঙ্গীতের রূপ: ফার্মা কে এল এম প্রাঃ লিঃ; কলকাতা

২৫. সুকুমার সেন

১৯৪০: বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স (৬ষ্ঠ সং-১৯৭৮); কলকাতা

২৬. সৌমেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (সম্পাদিত)

১৩৮৪; ব্যাঙ্গ কবিতা ও গানে স্বদেশীকতা; সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার; কলকাতা।

২৭. স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৯২; সমকালের বাংলা গান ও রবীন্দ্র সংগীত; প্যাপিরাস; কলকাতা।

২৮. হায়াৎ মামুদ ও জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত (সম্পাদিত)

১৯৭৩: তোমার সম্রাজ্যে যুবরাজ; সাহিত্যিকা; ঢাকা।

*Dhaka University Institutional Repository*

# নজরুলের স্বদেশচেতনামূলক গানের তালিকা

১। আজ না-চাওয়া পথ দিয়ে কে এলে,
ঐ কংস কারার দ্বার ঠেলে

২। (আজ) ভারত-ভাগ্য-বিধাতার বুকে গুরু-লাঞ্ছনা-পাষাণ-ভার
আর্ত্ত-নিনাদে হাঁকিছে নকীব,- কে করে মুশকিল্ আসান তার?

৩। আজ ভারতের নব আগমনী
জাগিয়া উঠেছে মহাশ্মশান।

৪। আজি রক্ত নিশি-ভোরে
একি এ শুনি ওরে।

৫। আজি শৃঙ্খলে বাজিছে মাভৈঃ- বরাভয়,
এ যে আনন্দ-বন্ধন ক্রন্দন নয়।

৬। আমরা নীচে প'ড়ে রইব না আর
শোন্ রে ও ভাই জেলে,

৭। আমাদের জমির মাটী ঘরের বেটি
সমান, রে ভাই!

৮। আমার দেশের মাটী -
ও ভাই, খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি॥

৯। আমার শ্যামলা বরণ বাঙলা মায়ের
রূপ দেখে যা; আয়রে আয়।

১০। আমার সোনার হিন্দুস্থান!
দেশ-দেশ-নন্দিতা তুমি বিশ্বের প্রাণ।

১১। আমি বিধির বিধান ভাঙিয়াছি, আমি এমনি শক্তিমান!
মম চরণের তলে, মরণের মার খেয়ে মরে ভগবান!

১২। আমি মহাভারতী শক্তিনারী।
আমি কৃশ-তনু-অসিলতা, স্বাহা-আমি তেজ-তরবারি॥

১৩। আসে রে ঐ আসে ভারত-আকাশে
আশা-অরুণ রবি।

১৪। উদার ভারত! সকল মানবে
দিয়াছ তোমার কোলে স্থান।

১৫। এ কি অপরূপ রূপে মা তোমায় হেরিনু পল্লী-জননী।
ফুলে ও ফসলে কাদা মাটী জলে ঝলমল করে লাবণী।

১৬। একি বেদনার উঠিয়াছে ঢেউ দূর সিন্ধুর পারে,
নিশীথ-অন্ধকারে।

১৭। একে একে সব মেরেছিস জাতটা শুধু ছিল বাকী।
টিকি ধরে টানিস তোরা, তারেও এবার মারবি নাকি॥

*Dhaka University Institutional Repository*

১৮। এ কোন্ পাগল পথিক ছুটে এলো বন্দিনী মা'র আঙ্গিনায়।
ত্রিশ কোটি ভাই মরণ-হরণ গান গেয়ে তাঁর সঙ্গে যায়।

১৯। এই দেশ কা'র? তোর নহে আর।
রে মূঢ় সন্তান! ভারত-মাতার।

২০। এই ভারতে নাই যাহা তা' ভূ-ভারতে নাই।
মানুষ যাহা চায় স্বর্গে গিয়ে, আমরা হেথায় পাই।

২১। এই শিকল-পরা ছল মোদের এ শিকল-পরা ছল।
এই শিকল প'রেই শিকল তোদের কর্‌ব রে বিকল।

২২। এস এস এস ওগো মরণ !
এই মরণ-ভীতু মানুষ-মেষের ভয় কর গো হরণ।

২৩। এস অষ্টমী-পূর্ণচন্দ্র। এস পূর্ণিমা-পূর্ণচাঁদ !
ভেদ করি পুনঃবন্ধ কারার অন্ধকারের পাষাণ ফাঁদ।

২৪। এস বিদ্রোহী মিথ্যা-সূদন আত্মশক্তি-বুদ্ধ বীর!
আনো উলঙ্গ সত্য-কৃপাণ, বিজলী ঝলক ন্যায়-অসির ॥

২৫। এই বেদলা নে ঘর ছেয়ে
এই দেশটা ভীষণ মূর্খ / এবার ঘুচাবো দেশের দুঃখ

২৬। এস মা ভারত-জননী আবার
জগৎ-তারিণী সাজে।

২৭। এস যুগ-সারথি নিঃশঙ্ক নির্ভয়।
এ-চির-সুন্দর অভেদ অসংশয়।

২৮। ঐ অভ্র-ভেদী তোমার ধ্বজা
উড়্‌লে আকাশ-পথে।

২৯। ঐ তেত্রিশ কোটি দেব্‌তাকে তোর তেত্রিশ কোটি ভূতে
আজ নাচ্ বুঢ়্‌টি নাচায় বাবা উঠ্‌তে বস্‌তে শুতে।

৩০। ও ভাই মুক্তি-সেবক দল!
তোদের কোন্ ভায়ের আজ বিদায়-ব্যথায় নয়ন ছল-ছল?

৩১। ওঠ্‌রে চাষী, জগদ্বাসী, ধর ক'ষে লাঙ্গল।
আমরা মরতে আছি- ভাল করেই মর্‌ব এবার চল॥

৩২। ওরে আজ ভারতে নব যাত্রাপথের
বাঁশী বাজ্‌ল বাজ্‌ল বাঁশী।

৩৩। ওরে ধ্বংস-পথের যাত্রী-দল!
ধর্ হাতুড়ি, তোল্ কাঁধে শাবল॥

৩৪। ওড়াও ওড়াও লাল নিশান।.....
দুলাও মোদের রক্ত-পতাকা/ ভরিয়া বাতাস, জুড়ি' বিমান!

৩৫। কল-কল্লোলে ত্রিংশ কোটি-কণ্ঠে উঠেছে গান।
জয় আয'্যাবর্ত্ত, জয় ভারত, জয় হিন্দুস্থান॥

৩৬। কারা-পাষাণ ভেদি' জাগো নারায়ণ!
কাঁদিছে বেদীতলে আর্ত্ত জনগণ,

*Dhaka University Institutional Repository*

৩৭। কারার ঐ লৌহ-কপাট,
ভেঙে ফেল্, কররে লোপাট

৩৮। কালের শঙ্খে বাজিছে আজও তোমারই মহিমা, ভারতবর্ষ।
প্রণতি জানায়ে বিশ্বভুবন শিখিছে আজিও তব আদর্শ ॥

৩৯। 'কি দেখিতে এসে কি দেখিনু শেষে'/রিপোর্ট লেখেন সায়মন
হুটোপুটি করে ছুটোছুটি করে/ বুড়োবুড় কাজে নাই মন !

৪০। খুশী লয়ে খোশরোজের আর খেয়ালী খোশ নসীব।
জ্বাল দেওয়ালী শবে রাতের জ্বালরে তাজা প্রাণ-প্রদীপ ॥

৪১। গঙ্গা সিন্ধু নর্মদা কাবেরী যমুনা ওই,
বহিয়া চলেছে আগের মতন

৪২। গুনে গরিমায় আমাদের নারী আদর্শ-দুনিয়ায়।
রূপে লাবণ্যে মাধুরী ও শ্রীতে হুরীপরী লাজপায় ॥

৪৩। ঘন-ঘোর-মেঘ-ঘেরা দুর্দ্দিনে ঘনশ্যাম
ভূ-ভারত চাহিছে তোমায়।

৪৪। ঘোর্- ঘোর্ রে ঘোর্ রে আমার সাধের চর্কা ঘোর।
ঐ স্বরাজ-রথের আগমনী শুনি চাকার শব্দে তোর ॥

৪৫। চল্ রে চপল তরুণদল বাঁধন-হারা।
চল্ অমর সমরে চল্ ভাঙি' কারা

৪৬। চাঁদের কন্যা চাঁদ সুলতানা, চাঁদের চেয়েও জ্যোতি।
তুমি দেখাইলে মহিমান্বিতা নারী কি শক্তিমতী ॥

৪৭। চীন ও ভারতে মিলেছি আবার মোরা শত কোটি লোক।
চীন ভারতের জয় হোক! ঐক্যের জয় হোক্! সাম্যের জয় হোক্।

৪৮। জগতে আজিকে যারা আগে চলে ভয়-হারা
ডেকে যায় আজি তারা, চল্রে সুমুখে চল্।

৪৯। জননী! জননী! আবার জাগো শুভ্র শারদ-প্রাতে
আঁখি তোল অনসিত অনাহত মহিমাতে।

৫০। জননী মোর জন্মভূমি, তোমার পায়ে নোয়াই মাথা।
স্বার্গাদপি গরীয়সী স্বদেশ আমার ভারত-মাতা ॥

৫১। জবা-কুসুম-সঙ্কাশ রাঙা অরুণ রবি
তোমরা উঠিছ; না-আসা-দিনের তোমরা কবি।

৫২। জয় ভারতী শ্বেত শতদল বাসিনী,
বিষ্ণু-শরণ-চরণ আদি বাণী!

৫৩। জাগে না সে জোস লয়ে আর মুসলমান।
করিল জয় যে তেজ লয়ে দুনিয়া জাহান ॥

৫৪। জাগো জাগো জাগো হে দেশ-প্রিয়!
ভারত চাহে তোমায় হে বীর-বরণীয়॥

*Dhaka University Institutional Repository*

৫৫। জাগো দুস্তর পথের নব যাত্রী / জাগো জাগো
ঐ পোহাল তিমির রাত্রি! / জাগো জাগো ॥

৫৬। জাগো রে তরুণ দল!
(স্বতঃ) উৎসারিত ঝর্ণাধারার প্রায় জাগো প্রাণ-চঞ্চল ॥

৫৭। জাগো হে রুদ্র, জাগো রুদ্রাণী,
কাঁদে ধরা দুঃখ-জরজর।

৫৮। জাগো হে রুদ্র, জাগো রুদ্রাণী,
কাঁদে ধরা দুখ-জরজর!

৫৯। জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত-জালিয়াৎ খেল্‌ছ জুয়া।
ছু'লেই তোর জাত যাবে? জাত ছেলের হাতের নয়তো মোয়া ॥

৬০। ঝড়-ঝঞ্ঝার ওড়ে নিশান, ঘন-বজ্রে বিষাণ বাজে।
জাগো জাগো তন্দ্রা-অলস রে, সাজো সাজো রণ-সাজে ॥

৬১। তোমারি জেলে পালিছ ঠেলে, তুমি ধন্য ধন্য হে।
আমার এ গান তোমারই ধ্যান, তুমি ধন্য ধন্য হে ॥

৬২। ত্রিংশ কোটি তব সন্তান ডাকে তোরে।
ভুলে আছিস্ দেশ-জননী কেমন ক'রে।

৬৩। থাকিতে চরণ মরণে কি ভয়, নিমেশে যোজন ফরসা।
মরণ-হরণ নিখিল-শরণ জয় শ্রীচরণ ভরসা ॥

৬৪। দড়া দড়ির লাগবে গিঁঠ/ গোল-টেবিলের বৈঠকে।
ঠোকর মারে লোহায় ইট/ এ ঠকে কি ঐ ঠকে ॥

৬৫। দাদা বলত কিসের ভাবনা (হুঁ হুঁ)
ওদের আছে বন্দুক কামান আমাদের আছে নাদনা।

৬৬। দিকে দিকে পুনঃজ্বলিয়া উঠেছে দীন-ইসলামী লাল মশাল।
ওরে বেখবর তুইও ওঠ্ জেগে তুইও তোর প্রাণপ্রদীপ জ্বাল ॥

৬৭। দুরন্ত দুর্ম্মদ প্রাণ অফুরান
গাহে আজি উদ্ধত গান।

৬৮। দুঃখ কি ভাই, হারানো সুদিন ভারতে আবার আসিবে ফিরে,
দলিত শুষ্ক এ মরুভূ পুনঃ হ'য়ে গুলিস্তা হাসিবে ধীরে ॥

৬৯। দুঃখ-সাগর মন্থন শেষ
ভারতলক্ষ্মী আয় মা আয়

৭০। দে গরুর গা ধুইয়ে-
ষণ্ডা মার্কা গিন্নি গণ্ডাতিনেক আণ্ডা বাচ্চা

৭১। দে দোল্ দে দোল্।
জাগিয়াছে ভারত-সিন্ধু-তরঙ্গ কল-কল্লোল।

৭২। দেশ গৌড়-বিজয়ে দেবরাজ
গগনে এলো বুঝি সময়-সাজে।

*Dhaka University Institutional Repository*

৭৩। "দেশপ্রিয় নাই" শুনি ক্রন্দন সহসা প্রভাতে জাগি।
আকাশে ললাট হানিয়া কাঁদিছে ভারত চির-অভাগী ॥

৭৪। ধর্ম্মের পথে শহীদ যাহারা আমরা সেই সে জাতি
সাম্য মৈত্রী এনেছি আমরা বিশ্বে করেছি জ্ঞাতি-

৭৫। ধ্বংস কর এই কচুরী-পানা!
(এরা) এরা লতা নয় পরদেশী অসুর ছানা ॥

৭৬। নখ-দন্ত-বিহীন চাকুরী অধীন/ আমরা বাঙালি বাবু
পায়ে গোদ, গায়ে ম্যালেরিয়া, বুকে কাশি লয়ে সদা কাবু ॥

৭৭। নতুন পথের যাত্রা-পথিক / চালাও অভিযান!
উচ্চ কণ্ঠে উচ্চা'র আজ- / "মানুষ মহীয়ান"।

৭৮। নব-জীবনের নব-উত্থান-/ আজান ফুকারি' এস নকীব্।
জাগাও জড় ! জাগাও জীব!

৭৯। নবীন আশা জাগ্‌ল যে রে আজ!
নতুন রঙয়ে রাঙা তোদের সাজ ॥

৮০। নমঃ নমঃ নমো বাঙলা দেশ মম
চির-মনোরম চির-মধুর।

৮১। নমঃ নমঃ রাম খুটি
তুমি গদিয়া বসেছ আমাদের ঘরে সাধ্য নাই যে উঠি ॥

৮২। নমো নমো নমঃ হিম-গিরি-সুতা
দেবতা-মানস-কন্যা।

৮৩। নাহি ভয় নাহি ভয়।
দুঃখ-সাগর মন্থন শেষ, / আসে মৃত্যুঞ্জয়।

৮৪। পদ্মা-মেঘনা-বুড়ি গঙ্গা-বিধৌত পূর্ব্ব দিগন্তে।
তরুণ-অরুণ-বীণা বাজে তিমির বিভাবরী অন্তে ॥

৮৫। পুঁথির বিধান যাক্ পুড়ে তোর,
বিধির বিধান সত্য হোক!

৮৬। বগল বাজা দুলিয়ে মাজা/ বসে কেন অম্‌ণী রে।
ছেঁড়া পেলে লাগাও চাঁটি/ মা হবেন আজ ডোমনি রে ॥

৮৭। বজ্র আলোকে মৃত্যুর সাথে হবে নব পরিচয়,
জয় জীবনের জয়।

৮৮। বদনা গাড়ুতে গলাগলি করে এর প্যাকেটের আসনাই
মুসলমানের হাতে নাই ছুরি, হিন্দুর হাতে বাঁশ নাই॥

৮৯। বন্দি তোমায় ফন্দি-কারার গণ্ডী-মুক্ত বন্দী-বীর,
লঙ্ঘিলে আজি ভয়-দানবের ছয়-বছরের জয়-প্রাচীর।

৯০। বন্দীর মন্দিরে জাগো দেবতা!
আনো অভয়ঙ্কর শুভ-বারতা।

৯১। বল, নাহি ভয়, নাহি ভয়!

*Dhaka University Institutional Repository*

বল, মাভৈঃ মাভৈঃ, জয় সত্যের জয়!

৯২। বল ভাই মাভৈঃ মাভৈঃ,
নবযুগ ঐ এলো ঐ / এলো ঐ রক্ত-যুগান্তর রে।

৯৩। বসেছে শান্তি-বৈঠকে বাঘ, সিংহ, হাঙর, নেকড়ে।
বৈষ্ণব গরু, ছাগ মেষ এসে হরিবোল বলে দেখরে ॥

৯৪। বাঙলার 'শের', বাঙলার শির,
বাঙলার বাণী, বাঙলার বীর / সহসা ও-পারে অস্তমান।

৯৫। বাঙলা মা তোর সোনার ক্ষেতে দেখা যায় কার আঁচলখানি
কার রূপের আলোয় আকাশ-বাতাস, ভরে গেল শ্যাম-বনানী।

৯৬। বাজাও প্রভু বাজাও ঘন বাজাও
ভীম বজ্র-বিষাণে দুর্জ্জয় মহা-আহ্বান তব, / বাজাও!

৯৭। বাজিছে দামামা, বাধরে আমামা,
শির উচু করি মুসলমান।

৯৮। বাজে ওই বন্দনা-প্রভাতী, জাগে অরুণ ভাতি।
শ্রান্ত এ নিদ্রিত ভারতে জাগে নবীন জাতি ॥

৯৯। বিদায়-রবির করুণিমায় অবিশ্বাসীর ভয়,
বিশ্বাসী! বল্ আস্‌বে আবার প্রভাত-রবির জয়।

১০০। বিশাল-ভারত-চিত্ত-রঞ্জন হে দেশবন্ধু এসো ফিরে।
কাণ্ডারী হে, দেখাও দিশা অসীম অশ্রু-সাগর-নীরে ॥

১০১। বীরদল আগে চল্ / কাঁপাইয়া পদভরে ধরণী টলমল।
যৌবন-সুন্দর চির-চঞ্চল ॥

১০২। ভাই হয়ে ভাই চিন্‌বি আবার গাইব কি আর এমন গান!
(সেদিন) দুয়ার ভেঙে আস্‌বে জোয়ার মরা গাঙে ডাক্‌বে বান ॥

১০৩। ভাইয়ের দোরে ভাই কে'দে যায় তুলে নে না তারে কোলে।
মুছিয়ে দে ত'র নয়নের জল সে যে আপন মায়ের ছেলে ॥

১০৪। ভারত আজিও ভোলেনি বিরাট মহাভারতের ধ্যান।
দেশ হারায়েছে – হারায়নি তা'র আত্মা, ভগবান ॥

১০৫। ভারত-লক্ষ্মী মা আয় ফিরে এ-ভারতে।
ব্যাথায় মোদের চরণ ফেলে- অরুণ আশার সোনার রথে ॥

১০৬। ভারত শ্মশান হ'ল মা, তুই শ্মশানবাসিনী ব'লে।
জীবন্ত শব নিত্য মোরা, চিতাগ্নিতে মরি জ্বলে' ॥

১০৭। ভারতের দুই নয়ন-তারা হিন্দু-মুসলমান
দেশ জননীর সমান প্রিয় যুগল সন্তান / হিন্দু-মুসলমান ॥

১০৮। ভিক্ষা দাও! ভিক্ষা দাও !
ফিরে চাও ওগো পুরবাসী / সন্তান দ্বারে উপবাসী,

১০৯। ভুবনের নাথ! এ নব ভবনে তব আশীষ
ঝরুক শ্রাবণ-বারিধারা সম অহর্নিশ ॥

*Dhaka University Institutional Repository*

১১০। ভূমিকম্পের প্রলয়-লীলায় সব হ'ল ছারখার;
ভিক্ষার ঝুলি ছাড়া আজ ভাই সম্বল নাহি আর।

১১১। ভোল লাজ ভোল গ্লানি জননী
মুক্ত আলোকে জাগো।

১১২। মুসলিম আর হিন্দু মোরা দুই সহোদর ভাই।
এক বৃন্তে দু'টী কুসুম এক ভারতে ঠাঁই ॥

১১৩। মাগো তোমার অসীম মাধুরী
বিশ্বে পড়েছে ছড়ায়ে।

১১৪। মানবতাহীন ভারত শ্মশানে দাও মানবতা, হে পরমেশ ॥
কি হবে লইয়া মানবতাহীন ত্রিশ কোটি এই মানুষ-মেষ ॥

১১৫। মৃতের দেশে নেমে এল মাতৃনামের গঙ্গাধারা।
আয় রে নেয়ে শুদ্ধ হবি অনুতাপে মলিন যারা ॥

১১৬। মোরা একই বৃন্তে দুটী কুসুম হিন্দু-মুসলমান
মুস্‌লিম তার নয়ন-মণি, হিন্দু তাহার প্রাণ ॥

১১৭। মোরা ঝঞ্ঝার মতো উদ্দাম, মোরা ঝর্ণার মতো চঞ্চল,
মোরা বিধাতার মতো নির্ভয়, মোরা প্রকৃতির মতো সচ্ছল।

১১৮। মোরা মারের চোটে ভুত ভাগাবো, মন্ত্র দিয়ে নয়।
মোরা জীবন ভরে মার খেয়েছি আর প্রাণে না সয় ॥

১১৯। রাঙা পথের ভাঙন-ব্রতী অগ্রপথিক দল।
নাম্‌রে ধূলায়- বর্ত্তমানের মর্ত্ত্যপানে চল্ ॥

১২০। লক্ষ্মী মাগো এস ঘরে
সোনার ঝাঁপি লয়ে করে।

১২১। লক্ষ্মী মা তুই আয় গো উঠে সাগর-জলে সিনান করি'।
হাতে ল'য়ে সোনার ঝাঁপি, সুধার পাত্রে সূধা ভরি' ॥

১২২। শঙ্কাশূন্য লক্ষকণ্ঠে বাজিছে শঙ্খ ঐ।
পূণ্য-চিত্ত মৃত্যু-তীর্থ-পথের যাত্রী কই ॥

১২৩। শিকলে যাদের উঠেছে বাজিয়া বীরের মুক্তি-তরবারি,
আমরা তাদেরি ত্রিশ কোটি ভাই, গাহি বন্দনা-গীতি তারি ॥

১২৪। শুভ যাত্রার লগ্ন এসেছে কালের শঙ্খ বাজিছে ওই!
কে দেখাবে পথ, প্রদীপ তুলিয়া নিশীথ রাতের বন্ধু কই?

১২৫। শ্যামলা বরণ বাংলা মায়ের রূপ দেখে যা আয়রে আয়
গিরি-দরী, বনে-মাঠে, প্রান্তরে রূপ ছাপিয়ে যায় ॥

১২৬। সঙ্ঘশরণ তীর্থযাত্রা-পথে এসো মোরা যাই।
সঙ্ঘ বাঁধিয়া চলিলে অভয় সে পথে মৃত্যু নাই।

১২৭। সালাম, সালাম, জামালউদ্দীন আফগানী তস্‌লীম।
এশিয়ার নব-প্রভাত-সূর্য্য- পুরুষ মহামহিম ॥

*Dhaka University Institutional Repository*

১২৮। স্বদেশ আমার। জানি না তোমার শুধিব মা কবে ঋণ।
দিনের পরে মা দিন চলে যায়, এল না সে শুভ দিন ॥

১২৯। স্বপ্নে দেখেছি ভারত-জননী
তুই যেন রাজরাজেশ্বরী।

১৩০। সেই আমাদের বাংলাদেশ! রাজরাণী আজ ভিখারিণী।
কাঁদছে বনে লুটিয়ে কেশ ॥

১৩১। সোনার আলোর ঢেউ খেলে যায় মাঠের ঘাসে ঘাসে।
বাউল হাওয়ায় কানাকানি মা বুঝি ঐ আসে।

১৩২। হাতে হাত দিয়ে আগে চল, হাতে নাই থাক হাতিয়ার।
জমায়েত হও, আপনি আসিবে শক্তি জুলফিকার ॥

১৩৩। হায় পলাশী!
এঁকে দিলি তুই জননীর বুকে কলঙ্ক-কালিমা রাশি, হায় পলাশী ॥

১৩৪। হিন্দু-মুসলমান দুটী ভাই
ভারতের দুই আঁখি-তারা।

১৩৫। হে পার্থ-সারথি! বাজাও বাজাও পাঞ্চ জন্য শঙ্খ।
চিত্তের অবসাদ দুর কর কর দূর।

Dhaka University Institutional Repository

# বিস্তারিত গ্রন্থপঞ্জি

১. আতোয়ার রহমান

১৯৯৪; নজরুল বর্ণালী: নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা

২. আবদুল আজীজ আল-আমান (সম্পাদিত)

১৯৭৮; নজরুলগীতি অখণ্ড: ফরফ প্রকাশনী (ষষ্ঠ সং-১৯৯১); কলকাতা

৩. আবদুল মান্নান সৈয়দ

১৯৭৭; নজরুল ইসলাম কবি ও কবিতা; নজরুল একাডেমী; ঢাকা

১৯৮৯; নজরুল ইসলাম: কালজ কালোত্তর: বাংলা একাডেমী; ঢাকা

৪. ইদ্রিস আলী

১৯৯৭; নজরুল-সঙ্গীতের সুর : নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা

৫. ওয়াকিল আহমেদ (সম্পাদনা)

২০০০, কাজী নজরুল ইসলাম : জন্ম শতবর্ষ; বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি; ঢাকা

৬. করুণাময় গোস্বামী

১৯৯৩; বাংলা গানের বিবর্তন; বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

১৯৯০; বাংলা কাব্য গীতির ধারায় কাজী নজরুল ইসলামের স্থান; বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

১৯৮৫; বাংলা গান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

১৯৭৮; নজরুলগীতি প্রসঙ্গ, প্রথম পুন:মুদ্রণ, ঢাকা

৭. কল্পতরু সেনগুপ্ত

২০০০; কাজী নজরুল ইসলাম : জন্মশতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ; পশ্চিমবাংলা, বাংলা আকাদেমি, কলকাতা।

১৯৯৭ : নজরুলগীতি সহায়িকা (সম্পাদিত) : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সঙ্গীত আকাডেমি : কলকাতা

১৯৯২ ; জনগণের কবি কাজী নজরুল ইসলাম; পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ; কলকাতা

৮. কাজী মোহম্মদ এহিয়া

১৯৯৭; সার্বজনীন নজরুল; ঢাকা।

৯. জামরুল হাসান বেগ

১৯৯৮; নজরুল ইসলাম ও অন্যান্যরা : বাংলা একাডেমী; ঢাকা

১০. নারায়ণ চৌধুরী

১৯৯৩; কাজী নজরুলের গান; মুক্তধারা; ঢাকা

১৯৮৬; সংগীত বিচিত্রা; সাহিত্যলোক; কলকাতা

১৯৯১; বাংলা গানের জগত; ফার্মা কে এলএম প্রা: লি:, কলকাতা

*Dhaka University Institutional Repository*

১১. নীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৮৭; নজরুল-প্রভাকর; হসন্তিকা প্রকাশিকা; কলকাতা

১২. নেপাল মজুমদার

১৯৯৫; ভারতে জাতীয়তা আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ; দে'জ; কলকাতা

১৩. প্রভাতকুমার গোস্বামী (সম্পাদিত)

১৩৭৬; হাজার বছরের বাংলা গান; স্বারসত লাইব্রেরী; কলকাতা।

১৪. বাঁধন সেনগুপ্ত

১৯৭৬; নজরুল কাব্যগীতি : বৈচিত্র্য ও মূল্যায়ন; নবজাতক প্রকাশনী; কলকাতা

১৫. ব্রহ্মমোহন ঠাকুর

১৯৯৪; নজরুল সঙ্গীত কোষ; বাণী প্রকাশ; কলকাতা

১৬. বুদ্ধদেব রায়

১৯৯০; বাংলা গানের স্বরূপ; ফার্মা কে এল এম প্রা: লি: কলকাতা

১৭. মুজাফ্ফর আহমদ

১৯৬৫; কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা; মুক্তধারা (৩য় সং-১৯৮৭); ঢাকা

১৮. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম

১৯৮৩; সমকালের নজরুল ইসলাম: শিল্পকলা একাডেমী; ঢাকা

১৯. মুহম্মদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য লেখক

১৯৭৭; বাংলাদেশের ইতিহাস; নওরোজ কিতাবিস্তান (৬ষ্ঠ সং-১৯৯৮); ঢাকা

২০. মোবাশ্বের আলী

১৯৬৯; নজরুল-প্রতিভা; স্টুডেন্ট ওয়েজ; ঢাকা

২১. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (সম্পাদিত)

১৯৭২; নজরুল সমীক্ষা; ঢাকা

২২. মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ

১৯৮১; সাহিত্যের রূপকার : ইসলামিক ফাউন্ডেশন; ঢাকা।

২৩. মৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্তী

১৯৯৫; বাংলা কীর্তন গান; সাহিত্যলোক; কলকাতা

২৪. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী

১৯৯৩; বাংলা গানের ধারা; শিল্পকলা একাডেমী; ঢাকা।

২৫. রফিকুল ইসলাম

১৯৮২; কাজী নজরুল ইসলাম : জীবন ও কবিতা : মল্লিক ব্রাদার্স, ঢাকা।

১৯৭২; নজরুল জীবনী; বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ঢাকা

*Dhaka University Institutional Repository*

২৬. রাজিয়া সুলতানা

১৯৬৯; নজরুল অন্বেষা, মখদুমী এন্ড আহসানউল্লা লাইব্রেরী; ঢাকা।

২৭. শান্তি সিংহ (সম্পাদিত)

১৯৮৮; স্বদেশ আমার; নিউ বেঙ্গল প্রেস; কলকাতা

২৮. শাহবুদ্দিন আহমেদ

১৯৭৬; নজরুল সাহিত্য বিচার; মুক্তধারা; ঢাকা।

২৯. শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

১৯৯৫; কেউ ভোলে না কেউ ভোলে; নিউ এজ পাবলিশার্স; কলকাতা

৩০. সফিকুন্নবী সামাদী

২০০১; নজরুলের গান: কবিতার স্বাদ; জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশ; ঢাকা।

৩১. সীমা বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৮৬; রবীন্দ্র সংগীতে স্বদেশচেতনা; গণমন প্রকাশনী; কলকাতা

৩২. সুকুমার রায়

১৩৭৬; বাংলা সঙ্গীতের রূপ: ফার্মা কে এল এম প্রাঃ লিঃ; কলকাতা

৩৩. সুকুমার সেন

১৯৪০; বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স (৬ষ্ঠ সং-১৯৭৮); কলকাতা

৩৪. সৌমেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (সম্পাদিত)

১৩৮৪; ব্যাঙ্গ কবিতা ও গানে স্বদেশীকতা; সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার; কলকাতা।

৩৫. স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৯২; সমকালের বাংলা গান ও রবীন্দ্রসংগীত; প্যাপিরাস; কলকাতা।

৩৬. হায়াৎ মামুদ ও জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত (সম্পাদিত)

১৯৭৩; তোমার সাম্রাজ্যে যুবরাজ; সাহিত্যিকা; ঢাকা।

৩৭. হেমাঙ্গ বিশ্বাস

১৩৮৫; লোকসঙ্গীত সমীক্ষা বাংলা ও আসাম; এ মুখাজ্জী এন্ড কোং প্রাঃ লিঃ; কলকাতা।